কন্যা

অন্নদাশঙ্কর রায়

কন্যা

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা

দ্বিতীয় সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৬১

দাম তিন টাকা

প্রকাশক শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি এম লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

শ্রীমান্ পুণ্যশ্লোক রায়

কল্যাণীয়েষু

ভূমিকা

বিশ বছর আগে খেয়াল হয়েছিল বড়দা মেজদা সেজদা ও ছোড়দা এই চার দাদার কাহিনী লিখব। বইখানির নাম রাখব দাদাকাহিনী। বড়দার অংশটা আরম্ভ করে দিয়েছিলুম। কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারিনি।

পরে এক সময় নতুন একটা খেয়াল চাপে। সৌন্দর্যের অন্বেষণে বাহির হবে চার বন্ধু। তাদের অন্বেষণের কাহিনী হবে রূপাভিসার। কিন্তু এটাও খাতার রাজ্যে পড়ে থাকে। যেখানে অসংখ্য টুকিটাকি, টুকরো কথা।

আবার এক খেয়াল এলো। ছড়া লিখছি, রূপকথা কেন নয়? বড়দের রূপকথা। রাজকন্যা। রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সওদাগরপুত্র, কোটালপুত্র।

রাজকন্যা লিখব শুনে গৃহিণী বললেন, রাজকন্যা নয়। শুধু কন্যা। আমি ভেবে দেখলুম সেই ভালো। মনে পড়ে গেল একটি প্রিয় ছড়া—

যাদু, এ তো বড় রঙ্গ! যাদু, এ তো বড় রঙ্গ!
চার কালো দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
কাক কালো কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ
তাহার অধিক কালো, কন্যে, তোমার মাথার কেশ।

১৬ই আশ্বিন, ১৩৬০

অন্নদাশঙ্কর রায়

সূচী

কন্যা

অন্বেষণের পূর্বাহ্ণ

১৯২৪ সালের গ্রীষ্মকালটা যাঁরা পুরীতে কাটিয়েছিলেন তাঁদের কারো কারো হয়তো মনে আছে, লাটসাহেবের বাড়ীর কাছে বালুর উপর একটা নৌকোর ছায়ায় একসঙ্গে বসে থাকতে বা হেলান দিয়ে শুয়ে থাকতে প্রায়ই দেখা যেত চার জন তরুণকে। কী সকাল কী সন্ধ্যা কী দিন কী রাত।

ওই যার পরণে পট্টবস্ত্র আর ফিনফিনে রেশমী পিরাণ তার নাম কান্তি। গৌরবরণ সুপুরুষ। মাথায় বাবরি চুল, সুঠাম সুমিত গড়ন, প্রাণের চাঞ্চল্য প্রতি অঙ্গে। চলে যখন, চরণপাতের ছন্দে নাচের লহর ওঠে। ও যেন রূপকথার রাজপুত্র। হাতে চাঁদ কপালে সূর্য্যি।

আর ওই যার পোশাক শাদা জিনের ট্রাউজার্স, শাদা টেনিস শার্ট, অথচ গায়ের রঙ্ শামলা তার নাম তন্ময়। তন্ময়কে বোধ হয় সুপুরুষ বলতে বাধে, কিন্তু পুরুষোচিত চেহারা বটে ওই ছ'ফুট লম্বা চল্লিশ ইঞ্চি ছাতি নওজোয়ানের। তন্ময় না হয়ে বিনোদ যদি হতো তার নাম তা হলেই মানাত। একটা বিনোদ-বিনোদ ভাব ছিল তার চোখে মুখে চালচলনে। কান্তিকে রাজপুত্র বললে তন্ময়কে বলতে হয় কোটালপুত্র।

ন'হাত খদ্দরের ধুতি খদ্দরের ফতুয়া যার গায়ে তার নাম অনুত্তম। দিন নেই রাত নেই সব সময় একজোড়া নীল চশমা তার চোখে। ইস্পাতের মতো কঠিন উজ্জ্বল ধারালো তার মুখ। পদক্ষেপে দৃঢ়তা। কাঁধ থেকে পৈতের মতো ঝোলানো থাকে একটা খদ্দরের ঝোলা। তাতে তকলি পাঁজ ও লাটাই। যখন খেয়াল হয় সুতো কাটে। বলা যাক মন্ত্রীপুত্র।

আর একজনের হাতে কালো ছাতা। বেলা পড়ে গেছে, মাথায় রোদ লাগছে না, সুজন তবু ছাতা বন্ধ করবে না। যেন ওটা ছাতা নয়, ঘোমটা কি বোরখা। মানুষটি মুখচোরা, লাজুক। নয়ানসুকের পাঞ্জাবী ও মিহি শান্তিপুরী ধুতি পরে। গোলগাল নরম নধর নন্দদুলালকে সওদাগরপুত্র বলব না তো বলব কাকে! অবশ্য রূপ-কথার সওদাগরপুত্র। সত্যিকারের নয়।

বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে চার বন্ধু এসেছিল হাওয়াবদল করতে। হাওয়াবদলটা উপলক্ষ। আসলে ওরা এসেছিল ওদের জীবনের একটা চৌমাথায়। কয়েকটা মাস একসঙ্গে কাটিয়ে চার জন চার দিকে যাত্রা করবে। কান্তি বেরিয়ে পড়বে নাচ শিখতে, মণিপুরী দক্ষিণী গুজরাতী উত্তরভারতী। নাচের দলে যোগ দিয়ে দেশবিদেশ ঘুরবে। নিজের দল গড়বে। তন্ময় তো বিলেতফের্তা ক'ভাইয়ের ন ভাই। বিলেত না গেলে তার জাত যাবে। অক্‌স্‌ফোর্ডে তার জন্যে জায়গা পাওয়া গেছে। জাহাজেও। টেনিস ব্লু হতে তার শখ। জীবিকার পক্ষে ওর উপযোগিতা নেই বলে কষ্ট করে পড়াশুনাও করতে হবে। অনুত্তম ফিরে যাবে জেলে। গান্ধীজী সম্প্রতি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। খুব সম্ভব তিনি কর্মীদের ডাক দেবেন গণ-সত্যাগ্রহের জন্যে প্রস্তুত হতে। অনুত্তম আবার পড়া বন্ধ করবে অনির্দিষ্ট কাল। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত সেও স্বাধীন নয়। জীবিকার জন্যে তৈরি হবার স্বাধীনতা তার নেই। সুজন ফিরে যাবে কলকাতা। এম.এ. পড়বে। তার পরে হবে সম্পাদক ও সাহিত্যিক। তার ধারণা সংসার চালানোর পক্ষে ঐ যথেষ্ট। নিজের লেখনীর 'পর অসীম বিশ্বাস। কলম নাকি তলোয়ারের চেয়ে জোরালো।

বিদায়ের দিন যতই ঘনিয়ে আসছিল ততই তাদের চার জনের মন কেমন করছিল চার জন্যের জন্যে। ততই যেন তারা পরস্পরকে কাছে টানছিল চার জোড়া হাত দিয়ে চার গুণ করে। কেউ কাউকে

ছেড়ে একদণ্ড থাকবে না, একজন অনুপস্থিত হলে বাকী তিন জন অস্থির হয়ে ছুটবে তার সন্ধানে। তন্ময় উঠেছে এক ইউরোপীয় হোটেলে। কান্তি তার মাসিমার বাড়ী। অনুত্তম ও সুজন ধর্মশালায়। বলা বাহুল্য তাদের দুজনের অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়। সুজন পড়ে স্কলারশিপের টাকায়। আর অনুত্তম চালায় ছেলে পড়িয়ে। একসঙ্গে থাকতে পারে না বলে তাদের চার জনের মনে খেদ আছে। ধর্মশালাতেই চারজনে উঠত, কিন্তু তন্ময়রা ব্রাহ্ম, আর কান্তির মাসির বাড়ী থাকতে সে কী করে ধর্মশালায় ওঠে! সম্ভব হলে সে-ই বরং তার মাসির ওখানে সদলবলে উঠত। কিন্তু হপ্তার পর হপ্তা মাসের পর মাস দলবল নিয়ে থাকলে মাসির উপর উৎপাত করা হয়। এক ধর্মশালা থেকে আর এক ধর্মশালায় বদলি হতে হতে চললে তিন চার মাস কাউকে কষ্ট না দিয়ে দিব্যি কাটানো যায়। অনুত্তম জেল খাটিয়ে মানুষ। নিজে কষ্ট পেতে জানে ও চায়। ওটা তার প্রস্তুতির অঙ্গ। কিন্তু সুজনের হয়েছে মুশকিল। সে একটু যত্ন আত্তি ভালোবাসে। একটি মাসি কি পিসি কি দিদি পেলে সে বর্তে যায়। অথচ এমন মুখচোরা যে যাঁদের সঙ্গে তার পরিচয় তাঁদের কাউকে মুখ ফুটে একবার মাসিমা কি দিদি বলে ডাকবে না।

আর কান্তি? কান্তি ঠিক তার বিপরীত। ওই যে মাসিমা উনি কি তার আপন মাসিমা নাকি? আরে না। পাতানো মাসিমা। কবে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এই পুরীতেই। তার পর যতবার পুরী এসেছে প্রত্যেক বার তাঁর ওখানে উঠেছে, তিনিও তাকে অন্যত্র উঠতে দেননি। হোটেলের খাওয়া তার মুখে রোচে না। ধর্মশালায় থেকে মন্দিরের প্রসাদ খেয়ে বেশ এক রকম তৃপ্তি পাওয়া যায়, কিন্তু যেখানে রোজ নতুন লোক আসছে রোজ নতুন লোক যাচ্ছে সেখানে বেশি দিন থাকতে মন লাগে না, মন চায় ওদের সঙ্গে পালাতে। কিংবা ওদের সঙ্গ এড়াতে। কান্তি সেইজন্যে মাসিমা পিসিমার

খোঁজে থাকে। পেয়েও যায়। তার আলাপ করার পদ্ধতি হলো এই। হঠাৎ দেখতে পেলো মন্দিরের পথ দিয়ে কে একজন মহিলা যাচ্ছেন। সঙ্গে একটি ছোট্ট ছেলে কি মেয়ে। পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, "এই যে মাসিমা। কবে এলেন? আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি কান্তি।" আশ্চর্য্যি! দশটা ঢিল ছুঁড়লে একটা লেগে যায়। মহিলাটিও বলে ওঠেন, "অ! কান্তি! কবে এলি?" দেখতে দেখতে আলাপ জমে ওঠে। আত্মীয়তা হয়ে যায়।

জীবনের একটা চৌমাথায় এসে পেঁাছেছে তারা চার বন্ধু। যেমন পেঁাছেছিল রূপকথার রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সওদাগরপুত্র, কোটাল-পুত্র। তেপান্তরের মাঠের সীমায় চার দিকে চার পথ। চার পথে চার ঘোড়া ছুটবে। আর কত দেরি? প্রত্যেকে অধীর। কেবল সুজন অধীর নয়। সে ধীর স্থির আত্মস্থ প্রকৃতির মানুষ। তার জীবনযাত্রা দু'দিন পরে বদলে যাচ্ছে না, বদলে যাক এটাও সে চায় না। চলতে চলতে যেটুকু বদলাবে সেটুকুর জন্যে সে প্রস্তুত। কিন্তু তার জন্যে তাকে কলকাতা ছাড়তে হবে না। এমন কি, তাকে তার ট্যামার লেনের বাসা ছাড়তে হবে না। তার পথ কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাসিকপত্রের অফিসে। সেই পথে ছুটবে তার ঘোড়া। ছুটবে, কিন্তু কদম চালে নয়, দুলকি চালে।

চার ঘোড়া চার দিকে ছুটবে, দিগ্বলয়ে মিলিয়ে যাবে তাদের ছায়া। কেউ কি কাউকে দেখতে পাবে আর এ জীবনে! একজনের সঙ্গে একজনের দেখা হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু সকলের সঙ্গে সকলের দেখা হওয়া একটা অর্ধোদয়যোগ কি চূড়ামণিযোগ বিশেষ। হবে না তা নয়। হবে, কিন্তু কবে? হয়তো বিশ বছর বাদে। হয়তো শেষ জীবনে। তখনকার সেই চৌমাথায় পেঁাছে গাছতলায় ঘোড়া বাঁধবে চার কুমার। গল্প করবে সারা রাত। কে কী হয়েছে,

কে কী পেয়েছে, কে কী করেছে, তার গল্প। আবার চার জনে একসঙ্গে বাস করবে, একসঙ্গে বেড়াবে বসবে ও শোবে। সে তাদের দ্বিতীয় যৌবন। দ্বিতীয় যৌবনে উপনীত হয়ে প্রথম যৌবনের দিকে ফিরে তাকাবে তারা। কিন্তু তার আগে নয়। তার আগে ফিরে তাকাতে মানা।

তন্ময় বলল, "ভাই, আবার আমরা এক জায়গায় মিলব তা আমি জানি। কিন্তু তার আগে আমাদের কৃতী হতে হবে সফল হতে হবে। জীবনটা তো হেলাফেলার জন্যে নয়। আর জীবনের সেরা সময় তো এই প্রথম যৌবন।"

কান্তি বলল, "সত্যি। আবার যখন আমরা মিলব তার আগে যেন যে যার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে থাকি। তখন যেন বলতে না হয় যে পরিকল্পনায় খুঁৎ ছিল।"

অনুত্তম বলল, "না, পরিকল্পনায় খুঁৎ নেই। চিন্তা করতে করতে, আলোচনা করতে করতে রাতকে দিন করে দিয়েছি দিনকে রাত করে দিয়েছি, মাসের পর মাস। খুঁৎ থাকলে নিশ্চয় ধরা পড়ত। হয়তো কাজ করতে করতে ধরা পড়বে। তার জন্যে ফাঁক রাখতে হবে।"

সুজন বলল, "ফাঁক রাখতে হবে না। ফাঁক আপনি রয়ে গেছে।"

বিস্মিত হয়ে কান্তি বলল, "সে কী!" তন্ময় বলল, "সে কী!" অনুত্তম বলল, "তার মানে?" কেবল বিস্মিত নয়, বিরক্ত। কেবল বিরক্ত নয়, ক্ষুব্ধ। যাবার বেলা পিছু ডাকলে যেমন বিশ্রী লাগে। অযাত্রা ঘটে গেল।

সুজন বলল, "কী করে বোঝাব! কিসের একটা অভাব বোধ করছি কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছে না। তোরা যদি বোধ না করিস্ তোরা এগিয়ে যা।"

স্তম্ভিত হলো তন্ময় কান্তি অনুত্তম। এই যদি তার মনে ছিল

এত দিন খুলে বলল না কেন সুজন? এখন ওরা করে কী! জীবনের সমস্ত পরিকল্পনা কি ঢেলে সাজতে হবে? তার সময় কোথায়!

সুজনকে যদি বিশ্বাস করতে না পারি তবে কান্তিকে বিশ্বাস কী! তাই ভেবে তন্ময় সুধালো কান্তিকে, "তুইও কি কিসের একটা অভাব বোধ করিস্?"

কান্তি এর উত্তর না দিয়ে পাল্টা সুধালো তন্ময়কে, "তুইও কি—"

অনুত্তম অন্যমনস্ক ছিল। ঠাওরালো তাকেই প্রশ্ন করা হয়েছে। বলল, "হাঁ, আমিও।"

বিচলিত হলো তন্ময় ও কান্তি। সামলে নিয়ে তন্ময় বলল, "আমারও তাই মনে হয়।"

তখন কান্তি পড়ে গেল একলা। অভিভূত হয়ে বলল, "তা হলে তাই হবে।"

সকলেই বুঝতে পেরেছিল এর পরে কী আসছে। এর পরে পরিকল্পনা রদ বদল। তাতে সুজনের তেমন কিছু আসে যায় না। কিন্তু বাকী তিনজনের যাত্রাভঙ্গ। ওহ্! কী পাষণ্ড এই সুজনটা! অভাব বোধ করিস্ তো কর্ না, বাপু। বলতে যাস্ কেন?

অনুত্তম ওদের মধ্যে বয়সে বড়। নীল চশমা চোখে থাকায় তাকে প্রবীণের মতো দেখায়। পরামর্শের জন্যে অন্যেরা তার দিকে তাকাচ্ছে দেখে সে একটু ভেবে নিয়ে বলল,. "ভয় আমাদের এই যে চরম মুহূর্তে আমাদের জীবনের পরিকল্পনা বুঝি ভেস্তে যায়। কিন্তু পরিকল্পনা তো আমাদের তাসের কেল্লা নয়। কত কাল ধরে আমরা জীবনের মূলসূত্রগুলো নিয়ে অবিশ্রান্ত আলোচনা করেছি। কোনোখানে এতটুকু কাঁচা রাখিনি। ভিৎ আমাদের পাথরের মতো পাকা। তারই উপর দাঁড়িয়েছে আমাদের পরিকল্পনা। গড়তে গেলে অদল

বদল হয়েই থাকে। গড়ছি তো আমরাই। তবে এত ভাবনা কিসের?"

তন্ময় বলল, "ভাবনা কিসের তা কি তুই জানিস্‌নে? যে অভাববোধ একদিন আগেও ছিল না সে যে অনাহূত অতিথির মতো এসে উপস্থিত হয়েছে। এসে বলছে আমার জন্যে কী ব্যবস্থা করেছ দেখি। ব্যবস্থা করা কি এতই সহজ যে জীবনটা যেমন ভাবে কাটাব স্থির করেছিলুম তেমনি ভাবে কাটাতে পারব বলে ভরসা হয়?"

কান্তি বলল, "না, ভরসা হয় না। তবে জীবনের মূলসূত্র-গুলোর উপর একবার হাত বুলিয়ে যাওয়া যাক অর্গ্যানের কীবোর্ডের মতো। প্রাণের কানে ঠিক বাজে কি না পরখ করা যাক।"

এবার ওরা তাকালো সুজনের দিকে। সুজন যেন জীবনের কীবোর্ডের উপর আঙুল বুলিয়ে বলে দিতে পারে কোন চাবিটা বাজছে, কোনটা বেসুর, কোনটা অসাড়। বন্ধুদের দশা দেখে সে দুঃখিত হয়েছিল। সে তো ইচ্ছা করে তাদের এ দশা ঘটায়নি। উদ্ধারের পন্থা যদি জানত তবে নিশ্চয় জানাত। কান্তি যা করতে বলছে তাই করে দেখা যাক। জীবনের মূলসূত্রগুলো স্থির আছে না অবোধ্য এক অভাববোধের টানে বিপর্যস্ত হয়েছে।

সুজন তখন ধ্যান করতে বসল। চোখ মেলে।

ধ্যানযোগে উপলব্ধি করল, করতে করতে বলতে লাগল, "আদি নেই, অন্ত নেই এ বিশ্বজগতের। কেউ যে কোনো দিন একে সৃষ্টি করেছে বা কোনো দিন একে ধ্বংস করবে আমাদের তা বিশ্বাস হয় না। নাস্তি থেকে এ আসেনি, নাস্তিতে ফিরে যাবে না। এর সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হতে পারি। নিঃসংশয় হতে পারছিনে কেবল আমাদের নিজেদের বেলা। আমরাও কি এসেছি অস্তি থেকে অস্তিতে, ফিরে যাব অস্তিতে? আমাদের ইনটেলেক্‌ট্‌ বলছে, কী জানি! কিন্তু ইনটুইশন বলছে, হাঁ। আমরা অস্তি থেকে অস্তিতে এসেছি, অস্তিতে রয়েছি, অস্তিতেই অস্ত যাব সন্ধ্যারবির মতো।

এক্ষেত্রে আমরা ইনটুইশনের উক্তি বিশ্বাস করব। বহির্জগতের মতো অন্তর্জগৎও সত্য। বহির্জগতের নিয়মকানুন বুঝে নেবার জন্যে ইনটেলেক্ট্, আর অন্তর্জগতের তল পাবার জন্যে ইনটুইশন। অন্তর্জগতের দিকে যখন তাকাই তখন দেখতে পাই তারও আদি নেই, অন্ত নেই। যখন তাতে ডুব দিই তখন দেখি জরা নেই, মৃত্যু নেই, বিকার নেই, বিচ্ছেদ নেই, নিত্য বসন্ত, নিত্য যৌবন। বহির্জগতের সমস্ত প্রতিবাদ সত্ত্বেও অন্তর্জগতের বা অন্তর্জীবনের আধি নেই, ব্যাধি নেই, ভয় নেই, উদ্বেগ নেই, কিছুই সেখানে হারায় না, ফুরোয় না, পালায় না, ঝরে না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেখি অমৃতময় দেবতা। দর্শন করি তাঁর মহিমা। দীনের মধ্যে দেখি লক্ষ্মীশ্রী, হীনের মধ্যে নারায়ণ। পীড়িতের মধ্যে, আর্তের মধ্যে শান্তম্ শিবম্। বিপন্নের মধ্যে দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। সবাইকে আমরা শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। সেই আমাদের দেবপূজা। আমাদের পূজা আমাদেরই কাছে ফিরে আসে। আমরাও পূজা পাই। হাঁ, আমরাও দেবতা। আমাদের কিসের অভাব! আমরা কি—"

"এই ধার ধরা পড়ে গেছে সুজন।" কান্তি বলল স্মিত হেসে। "কে যেন বলছিল কিসের একটা অভাব বোধ করছে! সুজন নয় তো!"

তন্ময় হো হো করে হেসে উঠল। "মূলসূত্র শিকেয় তোলা থাক। এখন বল্, তোর কিসের অভাব। এই, সুজন।"

"ডুবে ডুবে জল খেতে কবে শিখলি রে!" বলল অনুত্তম। "তোর কিসের অভাব তা আগে থেকে জানতে দিলি নে কেন!"

মূলসূত্রের খেই ছিঁড়ে গেল। সুজন বেচারি করে কী! চুপ করে সহ্য করল হাসি মস্করা। তার দশা দেখে কান্তি বলল, "থাক, ওকে আর ঘাঁটিয়ে কী হবে। অভাব নেই সে কথা ঠিক। অভাব আছে এ কথাও বেঠিক নয়। ইনটুইশন তো সব সময় খাটে না।

ইনস্টিংক্‌ট্ যখন বলে খিদে পাচ্ছে তখন খিদেটাই সত্য। সাপ দেখলে সুজনও ভয় পায়।”

হাসির হররা উঠল। কিন্তু তাতে সুজন যোগ দিল না। লক্ষ করে নিরস্ত হলো কান্তি। বলল, “থাক, সুজনের কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। আমার একটা প্রস্তাব আছে। অবধান করো তো নিবেদন করি।”

অনুত্তম বলল, “উত্তম!”

“কাল চিঠি পেয়েছি,” কান্তি বলল, “অধ্যাপক জীবনমোহন আসছেন এখানে। তাঁর হোটেলের ঠিকানা দিয়েছেন। সকলের তিনি অধ্যাপক, আমাদের তিনি সখা, দার্শনিক ও দিশারী। তিনি এলে পরে এক দিন তাঁর ওখানে গিয়ে দেখা করতে হবে, খুলে বলতে হবে, কার মনে কী আছে। যা আমাদের একজনের কাছেও স্পষ্ট নয় তা হয়তো তাঁর কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। কেমন? রাজী?”

তন্ময় বলল, “নিশ্চয়।” অনুত্তম বলল, “আচ্ছা।” সুজন বলল, “দেখি।”

জীবনমোহন তাঁর অর্ধেক জীবন দেশ দেশান্তরে কাটিয়ে অল্প দিন হলো অধ্যাপনার কাজ নিয়েছেন। ক’দিন টিকতে পারবেন বলা যায় না। ছাত্ররা সাক্ষাৎ করতে গেলে তাদের সিগারেট অফার করেন। এই নিয়ে কথা উঠলে বলেন, “কেন, আমিও তো ছাত্র।” কর্তারা তাঁর অধ্যাপনায় সন্তুষ্ট, কিন্তু তাঁর বেহায়াপনায় রুষ্ট। ছাত্ররাও প্রসন্ন নয়। কারণ তিনি পলিটিক্‌সের ধার ধারেন না, ধর্মের ধার দিয়ে যান না। অনুযোগ করলে বলেন, “মদ আমি খাইনে, অহিফেন ছুঁইনে।”

বয়স চল্লিশের ওপারে। বিয়ের ফুল ফুটল না এখনো। মাথার মাঝখানে টাক। দু’দিকের কেশ কাঁচাপাকা। জবাহরলালের মতো

সাজপোশাক। তেমনি তরুণ দেখায়। তবে টুপিটা আরো শৌখীন। চাউনিতে এমন কিছু আছে যার থেকে মনে হয় তিনি অনেক দূরের মানুষ। কে জানে কোন সুদূরে মানস সরোবরের হংস।

জীবনমোহনের হোটেলে দেখা করতে গেল চার বন্ধু। তিনি তাদের ডেকে নিয়ে গেলেন ছাদের উপরে। সেখানে বেশ নিরিবিলি। পায়ের তলায় সাগরের ঢেউ ফেনায় ফেনায় ফেটে পড়ছে, ছুটে আসছে, লুটিয়ে যাচ্ছে। আবার পা টিপে টিপে পিছু হটছে। ঝাঁপ দেবার আগে দম নিচ্ছে। দম নেবার সময় মুখে শব্দ নেই, ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় তর্জন গর্জন, ফিরে যাবার সময় সে কী মধুর মর্মর!

যত দূর দৃষ্টি যায় অসীম নীল। তার সঙ্গে মিশে গেছে অসীম কালো। অন্ধকার রাত। কিন্তু অন্ধকারও ফেনিয়ে উঠছে, ফেটে পড়ছে, ভেঙে যাচ্ছে মুঠো মুঠো তারায়, ফোঁটা ফোঁটা তারায়। তবে তার মুখে সোর নেই। থাকলেও শোনা যায় না, এত অস্ফুট ধ্বনি।

জীবনমোহন হাত জোড় করে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তারা বলে যেতে লাগল যা বলতে এসেছিল। বলল প্রধানত কান্তি। মাঝে মাঝে তন্ময়। ক্বচিৎ অনুত্তম। একবারও না সুজন। তবে তার নীরবতাও বাঙ্ময়।

এর পরে যখন জীবনমোহনের পালা এলো তিনি ছোট খাটো দুটো একটা প্রশ্ন করতে করতে কখন এক সময় শুরু করে দিলেন তাঁর বক্তব্য। বললেন কথাবার্তার মতো করে। সহজ ভাবে। বিনা আড়ম্বরে।

বললেন, "বিশ্বাস করবে কি না জানিনে, তোমাদের বয়সে আমারও মনে হতো কিসের যেন অভাব। সব কিছু থেকেও কী যেন নেই। কী যেন না হলে সব কিছু বিস্বাদ। পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের কোনোটাতে নেই লবণ। আমারও একজন অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপকের অধিক। তাঁর কাছে গেলুম উপদেশ চাইতে। তিনি বললেন, জীবনমোহন,

রত্ন কারো অন্বেষণ করে না। রত্নেরই অন্বেষণ করতে হয়। যাকে হাতের কাছে পাওয়া যায় না, যা সুদূর, তোমার জীবনকে করো সেই সুদূরের অন্বেষণ। জানতে চাইলুম, কী সে নিধি? কী তার নাম? তিনি বললেন, খুঁজতে খুঁজতে আপনি জানতে পাবে।"

সমস্ত মন দিয়ে শুনছিল তারা চারজন। জীবনমোহন আর কিছু বলবেন ভেবে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। কিন্তু তিনি উচ্চবাচ্য করলেন না।

তখন তন্ময় জিজ্ঞাসা করল, "যদি আপত্তি না থাকে তবে জানতে পারি কি, সার, কী সে নিধি!"

"না, আপত্তি কিসের?" তিনি একটু থামলেন। একটু ইতস্তত করলেন। তারপর বললেন, "The Eternal Feminine."

চমক লাগল তাদের চার বন্ধুর। আনন্দের হিল্লোল খেলে গেল তাদের বুকে ও মুখে। দেখতে পেলো না কেউ।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন স্বয়ং জীবনমোহন। বললেন, "তোমরা হয়তো ভাবছ এটা এমন কী অসামান্য কথা, কী এমন বিশেষত্ব আছে এটার! অসামান্য এইজন্যে যে এর সন্ধান রাখে এমন লোক 'লাখে না মিলল এক।' বিশেষত্ব এইখানে যে প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক দেশে এমন দু' পাঁচ জন তরুণ পাওয়া গেছে যারা এ অন্বেষণ বরণ করেছে, এ অন্বেষণে বাহির হয়েছে। তারা সিদ্ধার্থ হয়েছে এ কথা বলতে পারলে সুখী হতুম। কিন্তু একেবারে ব্যর্থ হয়েছে এ কথাও বলব না। তারা আর কিছু পারুক না পারুক আদিকাল থেকে চলে আসতে থাকা একটা অন্বেষণের ধারাকে আজ অবধি বহমান রাখতে পেরেছে।"

অভিভূত হয়েছিল চারজনেই। উচ্ছ্বসিত স্বরে কান্তি বলে উঠল, "এ অন্বেষণ আমি বরণ করব। আমি বাহির হব। আমি ব্যর্থ হতেও প্রস্তুত।"

আবেগভরে তন্ময় বলে বসল, "ব্যর্থ হব জেনেও আমি তৈরি।"

মুখচোরা সুজন, সেও মুখর হলো। "ব্যর্থতাই আমার শ্রেয়।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল অনুত্তম। "হায়! আমি যে স্বাধীন নই। দেশ যতদিন না স্বাধীনতা পেয়েছে ততদিন আমার আর কোনো অন্বেষণ অঙ্গীকার করার স্বাধীনতা নেই।"

তার ব্যথায় ব্যথী হয়ে জীবনমোহন বললেন, "বেচারা অনুত্তম!" তাঁর প্রতিধ্বনি করে তন্ময় কান্তি সুজন এরাও বলল, "বেচারা অনুত্তম!"

ফেরবার সময় দেখা গেল মাটিতে পা পড়ে না তাদের চার জনের। অনুত্তমেরও? হাঁ, অনুত্তমেরও। থাক, আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙ্‌ব না, শুধু এইটুকু ফাঁস করলে চলবে যে অনুত্তমের নীল চশমা সূর্যের ভয়ে নয়, বালুর ভয়ে নয়, ধরা পড়ার ভয়ে। সুজনের কালো ছাতাও তাই।

তন্ময় সারা পথটা "আহ্" "ওহ্" করে কাটাল। যেন যন্ত্রণায় ছটফট করছে। কিন্তু যন্ত্রণায় নয়। আনন্দে।

কান্তি বলল, "এতদিন পরে জীবনের একটা তাৎপর্য মিলল। জীবনটা একটা অন্বেষণ। হয়তো নিষ্ফল অন্বেষণ। তবু নিষ্ফলতাও শ্রেয়।"

"অবিকল আমার কথা।" বলল সুজন।

"আমারও।" তন্ময় সায় দিল।

অনুত্তম বলল, "মাটি করেছে দেশটা পরাধীন হয়ে। নইলে আমিও—"

কান্তি বলল, "দেশ স্বাধীন হোক পরাধীন হোক, এ অন্বেষণ স্বীকার করতে ও একে জীবনের কাজ করতে প্রতি জেনারেশনে দু'চার জন লোক থাকবে। নয়তো অন্বেষকদের পরম্পরা লোপ পাবে। আমাদের জেনারেশনে আমরাই সে দু'চার জন লোক। আমি

আর তন্ময় আর সুজন।”

অনুত্তম অনুযোগ করে বলল, “কেন? আমি কী দোষ করেছি? যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না? যে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করে সে কি শাশ্বতী নারীর ধ্যান করতে পারে না?”

কান্তি খুশি হয়ে বলল, “এই তো চাই। তোকে বাদ দিতে চায় কে?”

তন্ময় বলল “কেউ না।”

সুজন বলল, “তোকে নিয়ে আমরা চতুরঙ্গ।”

পরের দিন আবার জীবনমোহনের সঙ্গে ছাদের উপর বৈঠক। আবার সন্ধ্যার পরে। অনুত্তমকে তিনি প্রত্যাশা করেননি। বিস্মিত ও সস্মিত হলেন। বললেন, “আমি তো ভেবেছিলুম তোমরা হবে থ্রী মাস্কেটীয়ার্স।”

কান্তি বলল, “না, সার, আমরা থ্রী মাস্কেটীয়ার্স হব না। হব রূপকথার রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সওদাগরপুত্র, কোটালপুত্র। তবে যার অন্বেষণে যাব সে হবে রাজকন্যা।”

“যার নয়, যাদের। সে নয়, তারা।” সংশোধন করল অনুত্তম।

“তাদের একজনের নাম হবে রূপমতী।” তন্ময় বলল উত্তেজনা ভরে।

“আর একজনের নাম কলাবতী।” সুজন বলল মুখ নিচু করে।

“আর একজনের নাম,” অনুত্তম বলল, “পদ্মাবতী। পদ্মিনী।”

“হায়!” কপট দুঃখ প্রকট করল কান্তি। “সব ক'টি ভালো ভালো নাম তোরাই লুটে পুটে নিলি। আমার জন্যে বাকী রইল কী! কান্তিমতী!”

“বা!” জীবনমোহন তারিফ করে বললেন, “তোমাদের চার বন্ধুর প্রত্যেকের পছন্দ খাসা। কিন্তু চার জনের কোন জন রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র কোন জন, সওদাগরপুত্রটি কে, কোটালপুত্র কোনটি?”

এর উত্তরে ওরা চার জনেই নীরব। কিছুক্ষণ পরে অনুত্তম আমতা আমতা করে বলল, "স্যার, আমরা ঠিক জানিনে।"

জীবনমোহন হেসে বললেন, "উত্তর দেবার দায় পরীক্ষকের 'পর চাপালে! কিন্তু উত্তর তো এক রকম দেওয়াই আছে। কান্তি, তোমার পছন্দ রাজপুত্রের মতো। আর অনুত্তম, তোমার পছন্দ মন্ত্রীতনয়ের যোগ্য। আর সুজন, তোমার পছন্দ সওদাগরসুতের উপযুক্ত। আর তন্ময়, তোমার পছন্দ কোটালনন্দনের অনুরূপ। তা বলে তোমরা কেউ কারো চেয়ে খাটো নও। তোমাদের কন্যারাও সকলে সকলের সমতুল।"

তাঁর আশঙ্কা ছিল অনুত্তম সুজন তন্ময়—বিশেষ করে তন্ময়—হয়তো আঘাত পাবে। কিন্তু তন্ময় হলো স্পোর্টস্‌ম্যান। সে কান্তির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "অভিনন্দন! কিন্তু একালের রাজপুত্রদের দৌড় কতটুকু! কোটালনন্দনদেরই দোর্দণ্ড প্রতাপ।"

"আর মন্ত্রীতনয়দের হাতেই আসল ক্ষমতা।" হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল অনুত্তম।

"আর সওদাগরসুতদের হাতেই পুতুলনাচের অদৃশ্য তার।" সুজন বলল হাত বাড়িয়ে দিয়ে।

কান্তি কপট দুঃখে বিগলিত হয়ে বলল, "তাই তো, আমি তো খুব ঠকে গেছি।"

জীবনমোহন উপভোগ করছিলেন তাদের অভিনয়। বললেন, "কেউ ঠকে যায়নি। কেউ ঠকে যাবে না। এটা এমন একটা অন্বেষণ যে অন্বিষ্ট যদি না-ও মেলে, যদি মেলে কিন্তু মিলে হারিয়ে যায়, যদি মেলে কিন্তু ভুল মেলে, তা হলেও পরিতাপের কিছু নেই। এটা এমন একটা দিল্লীকা লাড্‌ডু যা খেলেও কেউ পশ্‌তায় না, না খেলেও কেউ পশ্‌তায় না।"

"তার পরে," তিনি আরো বললেন, "ক্ষমতার ক্ষেত্র এ নয়।

ক্ষমতার কথা অপ্রাসঙ্গিক। তোমার হাজার ক্ষমতা থাকলেও তাকে তুমি পাবে না, অনুত্তম। তাকে অধিকার করতে গেলেই তাকে হারাবে, তন্ময়। সুজন, ইটার্নাল ফেমিনিন যাকে বলেছি তার অন্য নাম ইটার্নাল বিউটি। কান্তি, তুমি চিরসৌন্দর্যের অভিসারে চলেছ।”

চিরসৌন্দর্যের অভিসার! কী গুরুভার তাদের ’পর ন্যস্ত! শাশ্বতী নারীর অন্বেষণ! কী ক্ষুরধার পন্থা! জীবনমোহন তাদের কাছে যে অসাধ্যসাধন আশা করছেন সে কি তাদের সাধ্য! কেন তবে তারা ক্ষমতার কথা মুখে আনে! না, ক্ষমতা তাদের নেই। উদ্দীপ্ত অথচ বিনম্র বোধ করছিল চার বন্ধু। নিয়তি তাদের চার জনকেই মনোনয়ন করেছে তাদের যুগে ও দেশে। কী বিস্ময়কর সৌভাগ্য! কিন্তু সেই সঙ্গে কী দুশ্চর ব্রত!

তারা স্থির করেছিল বেরিয়ে পড়বে, কিন্তু কিসের অভিমুখে তা স্থির ছিল না। তাদের লক্ষ্য স্থির করে দিলেন জীবনমোহন। অতি দূর সে লক্ষ্য। কোনো দিন সেখানে পৌঁছনো যাবে কি না সন্দেহ। স্বয়ং জীবনমোহন কি পৌঁছেছেন!

সে কথা কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেনি। শুধু তন্ময় তাঁকে আপন মনে গুন গুন করতে শুনেছে; "হায় কন্যা শামারোখ।"

শোনা অবধি কী যে হয়েছে তন্ময়ের, থেকে থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে, আর বলে, "হায় কন্যা রূপমতী!"

এ নিয়ে পরিহাস করে কান্তি। বুক চাপড়ে বলে, "হায় কন্যা কান্তিমতী!"

অনুত্তম তা শুনে বলে, "এ আবার কী নতুন খেলা শুরু হলো! আমাকেও হাহুতাশ করে বলতে হবে নাকি, হায় কন্যা পদ্মাবতী, হায় কন্যা পদ্মিনী!"

মুখচোরা সুজন মুখ ফুটে কিছু বলবে না। নইলে তাকেও বলতে শোনা যেত, "হায় কন্যা কলাবতী!"

কান্তি গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, "তন্ময়কে তা বলে প্রশ্রয় দিতে পারিনে। এক দিন তার মোহভঙ্গ হবে। কষ্ট পাবে।"

"কেন বল দেখি?" তন্ময় প্রশ্ন করে।

"কেন?" কান্তি বলে যায়, "চিরন্তনীকে কেউ কোনো দিন রূপের আধারে পায়নি। তুই পাবি কী করে? সে তো রূপে নেই, আছে রূপের ইঙ্গিতে। কোনো মেয়ের চাউনিতে, কারো হাসিতে, কারো কেশপাশে, কারো কণ্ঠস্বরে। রূপের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে, আভাস দিয়ে যায়, কারো ক্ষণিক পরশ, কারো ক্বচিৎ সঙ্গ। তুই আশা

করছিস একজন কেউ আছে যে তিলোত্তমার মতো সুন্দরী। একজন কেউ আছে যাকে ধরা যায়, ধরে রাখা যায়, দিনের পর দিন, সারা বছর, জীবনভর!"

"নিশ্চয়।" তন্ময়ের বচনে অবিচলিত প্রত্যয়। "কেন আশা করব না? কতটুকু দেখেছি এই পৃথিবীর! সেইজন্যেই তো আমি দেখতে বেরিয়েছি দেশ বিদেশ। দেখতে বেরিয়েছি তাকে যার নাম দিয়েছি রূপমতী। সে আছে। এবং আমি তাকে ধরবই, ধরে রাখবই, ঘরে ভরবই। তবে হাঁ, দশ বিশ বছর সময় লাগতে পারে। খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে আয়ু ফুরিয়ে আসবে হয়তো। সেইজন্যেই তো বলছি, হায় কন্যা রূপমতী! একবার দয়া করে ঠিকানাটা তোমার জানাও।"

হাসির কথা। কিন্তু হাসতে গিয়ে হাসি পায় না একজনেরও। তন্ময়ের ব্যাকুলতা তাদের অভিভূত করেছিল।

সুজন বলে, "সে আছে বৈকি। তবে তার রূপ তার দেহের নয়, তার আত্মার, তার অন্তরের। কাঁচের আড়ালে যেমন আলো থাকে, সে আলো কাঁচের নয়, সে আলো শিখার এও তেমনি। আমি যার ধ্যান করি সে শুকতারার মতো প্রভাময়ী, তার প্রভা কোনো অদৃশ্য আলোকবর্তিকার। কিন্তু তাকে আমি কোনো দিন পাব এ আশা আমার নেই। এ যেন তারকার জন্যে পতঙ্গের তৃষা।"

এবার অনুত্তমের পালা। "আমার পদ্মাবতী," বলে অনুত্তম, "ভরা পদ্মার মতো রূপসী। রূপ তার দেহে নয়, আত্মায় নয়, শতধার ইঙ্গিতে নয়, রূপ তার গতিবেগে, রূপ তার ক্রিয়ায়। আমি যার ধ্যান করি সে সুন্দরী নয়, কিন্তু কাজ তার সুন্দর। দেশের জন্যে মাথার চুল কেটে দিতে পারে কে? পদ্মাবতী। আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে কে? পদ্মিনী। তাকে কি পাওয়া যায় যে আমি পাব! তবে সে আছে নিশ্চয়।"

চার জনের লক্ষ্য এক, কিন্তু ধ্যানরূপ বা রূপধ্যান চতুর্বিধ। এটা আরো স্পষ্ট হয় যখন তন্ময় বলে, "চিরন্তনী নারী বলতে বোঝায় আগে নারী তার পরে চিরন্তনী। যে নারীই নয় সে চিরন্তনী হবে কী করে! আমি যাকে চাই সে আমার সঙ্গিনী, আমার জায়া, আমার সন্তানের জননী। সে আমাকে আনন্দ দেবে, তাকে নিয়ে আমি সুখী হব। এই সব কারণে তাকে আমার পাওয়া দরকার। ধরে রাখা দরকার। আমি চাই সহজ স্বাভাবিক জীবন, যাকে বলে গার্হস্থ্য আশ্রম। কিন্তু এই সব নয়। এর উপরে চাই রূপলাবণ্য, যার বিকাশ দেহবৃন্তে। অনুপম রূপলাবণ্য, অসাধারণ সৌন্দর্য। যা কোনো দিন শুকিয়ে যাবে না, আশী বছরেও তাজা থাকবে।"

"হ্যাঁ! বলিস্ কী রে!" কান্তি তামাশা করে। "কেবল রূপ নয়, যৌবন! তাও পাঁচ দশ বছর নয়, আশী বছর! ষোড়শী কোনো দিন জরতী হবে না! এই মাটির শরীরে এও তুই আশা করিস্।"

"তন্ময় কিনা তন্ময়।" টিপ্পনী কাটে অনুত্তম।

সুজন অন্যমনস্ক ভাবে বলে, "না, না। চিরন্তনী নারী বলতে বোঝায় আগে চিরন্তনী, তার পরে নারী। আগে অন্তর, তার পরে বাহির। আগে আত্মা, তার পরে দেহ। আমি যার ধ্যান করি সে যদি আমার সঙ্গিনী না হয় তা হলেই বা কী আসে যায়! সে যেখানেই থাকুক, যত দূরেই থাকুক, তার কিরণ এসে আমার গায়ে পড়ছে। পড়তে থাকবে। তাকে বিয়ে করতে পারলে ধন্য হতুম। কিন্তু তা কি সম্ভব! আর কাউকে বিয়ে করে তার ধ্যান করাও সম্ভব নয়। কাজেই আর কাউকে বিয়ে করাও অসম্ভব।"

কান্তি আবার রঙ্গ করতে যায়, কিন্তু অনুত্তম তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, "আমার মনে হয় সুজন জোর দিতে চায় চিরসৌন্দর্যের উপরে, শাশ্বত সুষমার উপরে, যা মূর্ত হয়েছে নারীতে, নারীর নারীত্বে। আর তন্ময় জোর দিতে চায় নারীত্বের উপরে, নারীর

রূপযৌবনের উপরে, যা পার্থিব হয়েও চিরন্তন। আমি বলি, চিরন্তনী নারী হচ্ছে সেই নারী যে প্রাত্যহিক জীবনে নিতান্ত সাধারণ অথচ সংকট মুহূর্তে একান্ত অসাধারণ। যার ঘোমটা খসে যায়, মুখ দেখতে পাওয়া যায় ঝড়ের রাতে বিজলীর ঝিলিকের মতো। সে আর কতটুকু সময়ের জন্যে! সেইটুকু সময় যদি দীর্ঘতর সময়ে পরিণত করার মন্ত্র জানা থাকত তা হলে ঐ মন্ত্র পড়ে আমি তাকে বিয়ে করতুম। তা কি আমি জানি যে বিয়ের স্বপ্ন দেখব।"

"বিয়ে! বিয়ে!" কান্তি এবার বিরক্তির স্বরে বলে, "ছেলে-ভোলানো ছড়া থেকে বুড়োভোলানো কবিতা পর্যন্ত সব জায়গায় দেখি বিয়ে! আচ্ছা বিয়ে পাগলা দেশ যা হোক। আমি কিন্তু বিয়ের মহিমা বুঝিনে। বিয়ে আমি করব না। আশী বছরের আয়েষাকেও না, আসমানের শুকতারাকেও না, অচপল চপলাকেও না। কোনো মেয়েকেই না। আমার চিরন্তনী নারী এক আধারে নেই, সকলের মধ্যে আছে। তিলোত্তমা নয়, তিলে তিলে ছড়ানো।"

তারপর নিজেই নিজের রসিকতায় হেসে ওঠে। "একজনকে বিয়ে করলে আর পনেরো হাজার ন'শো নিরনব্বুই জনের উপর অবিচার করা হয়। আমি তো দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ নই যে ষোলো হাজার জনের উপর সুবিচার করব। আমি বৃন্দাবনের কানু, সুবিচারের ভয়ে সবাইকে ছেড়ে যাই, এমন কি রাধাকেও।"

তন্ময় ব্রাহ্ম পরিবারে মানুষ হয়েছে। এসব কথা তার সংস্কারে বাধে। প্রাণে বাজে। সে কানে আঙুল দিয়ে বলে, "আমার জীবনের সূত্র একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

সুজন ব্রাহ্ম না হলেও ব্রাহ্ম সমাজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পড়াশুনা করেছে, খেলাধুলা করেছে। ওদের উৎসবে যোগ দিয়েছে, উপাসনায় চোখ বুজেছে। সেও আঘাত পেয়ে বলে, "আমি নিরাকারবাদী।"

অনুত্তম গান্ধীশিষ্য। পিউরিটান। সেও মর্মাহত হয়। বলে, "কান্তি, তুই নাচতে যাচ্ছিস, এই যথেষ্ট স্বৈরাচার। আর বেশি দূর যাস্ নে। গেলে পতন অবধারিত।"

"তোরা বড় বেশি সিরিয়াস। লীলা কাকে বলে জানিস্ নে। ভয়ের দিকটাই দেখিস্। কিন্তু যারা নাচতে জানে তারা সাপের মাথায় ভেকেরে নাচায়। আমি সহজিয়া।" এই বলে কান্তি যবনিকা টেনে দেয়।

জীবনমোহন তখনো ছিলেন পুরীতে। তাদের চার বন্ধুর বিতর্ক তাঁর কানে পৌঁছল। তিনি মিষ্টি হেসে বললেন, "নুনের পুতুল যখন সমুদ্র অন্বেষণে যায় তখন কী হয়? কী বলেছেন রামকৃষ্ণদেব? তোমরাও যাচ্ছ সাগরের মতো আকাশের মতো চিরন্তনের সন্ধানে। যদি কোনো দিন তাকে দেখতে পাও যা দেখবে তা তোমাদের কল্পনার অতীত। ধ্যানের অতীত। তাকে নিজের প্রতিমার ছাঁচে ঢালাই করতে চেয়ো না। চাইলে দেখবে সে রূপমতী বা কলাবতী নয়, পদ্মাবতী বা কান্তিমতী নয়। সে কে বলব? সে তন্ময়িনী বা সুজনিকা, কান্তিরুচি বা অনুত্তমা।"

তার পর হাসি ছেড়ে বললেন, "তাকে পাওয়া না পাওয়ার চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। আকাশকে কেউ কোনো দিন ধরতে পেরেছে? ঘরে ভরতে পেরেছে? অথচ ঘর জুড়ে রয়েছে আকাশ নয় তো আর কে? পাব, এ কথা জোর করে বলতে নেই। পাব না, একথাও মনে করতে নেই।"

ওরা তাঁকে ঘিরে বসে শুনতে লাগল। তিনি বলতে লাগলেন, "অনুত্তম, কান্তি, তন্ময়, সুজন। এ অন্বেষণ সুখের অন্বেষণ নয়। একে যেন সুখের অন্বেষণ করে না তোল। সুখ যে কোনো দিন আসবে না তা নয়। আপনা হতে আসবে, আপনা হতে যাবে। তার আসাযাওয়ার দ্বার খোলা রেখো। অনুত্তম, তোমাকে এসব না বললেও

চলত। বরং এর বিপরীতটাই বলা উচিত তোমাকে। না, এটা দুঃখের অন্বেষণও নয়। আর সুজন, তোমাকেও বলার দরকার ছিল না। তুমিও তো সুখের চেয়ে দুঃখের প্রতি প্রবণ। আর কান্তি, তোমাকে যা বলেছি তাই যথেষ্ট। শুধু, তন্ময়, তোমার জন্যেই আমার ভাবনা। মনে রেখো, সুখের অন্বেষণ তোমার জন্যে নয়। তোমার জন্যে রূপের অন্বেষণ। তুমি তার জন্যে।"

ওরা চার জনে নত হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিতে গেল। তিনি বললেন, "থাক, থাক, হয়েছে, হয়েছে। আমি এর পক্ষপাতী নই।" তার পর ওদের মাথায় হাত রেখে বললেন, "তোমাদের যাত্রা শুভ হোক।"

যাত্রা? যাত্রার জন্যে ওরা ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু ওদের ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল যে কেউ কারো সহযাত্রী হবে না। সেই-জন্যে যাত্রার দিন বিনা বাক্যে পেছিয়ে দিচ্ছিল। ওদিকে ওদের পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেছল। কাজেই কালহরণের তেমন কোনো অজুহাত ছিল না। সুজন ও তন্ময় পাশ করেছে, অনুত্তম ও কান্তি করেনি। এই রকমই হবে ওরা জানত। কান্তি তো ইচ্ছা করেই শূন্য খাতা দাখিল করেছিল কয়েকটা পেপারে। পাশ করলে পাছে তার গুরুজন তাকে যেতে না দেন গন্ধর্ব-বিদ্যা শিখতে গন্ধর্ব হতে। আর অনুত্তম সময় পেলো কখন যে পরীক্ষার পড়া করবে!

যাত্রার প্রসঙ্গে পরিকল্পনার প্রশ্ন উঠল আবার। কান্তি বলল, "আমাদের পরিকল্পনায় সেই যে ফাঁক ছিল সেটা কি তেমনি আছে না ভরেছে? কিসের যেন অভাব বোধ করছিল কেউ কেউ? এখনো কি করে?"

অনুত্তম তাকালো তন্ময়ের দিকে, তন্ময় সুজনের দিকে। সুজন বললে, "না, আমার তো আর অভাববোধ নেই। পেলেই যে অন্তর ভরে তা নয়। না পেলেও ভরে যদি জ্ঞাননেত্র খুলে যায়। জীবন-

মোহন আমাদের নেত্র উন্মীলন করেছেন। তিনি আমাদের গুরু।”

“আমারও অভাববোধ নেই,” স্বীকার করল তন্ময়। “পেতে চাই। পাইনি। তবু আমার অন্তর পূর্ণ। যার অন্বেষণে যাচ্ছি সেই জুড়ে আছে অন্তর। জুড়ে থাকবেও।”

“আমি যে কাকে চাই তা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। হয়তো এ জীবনে কোনো দিন তার দেখা পাব না, তবু আমার অভাব-বোধ থাকবে না।” বলল অনুত্তম।

কান্তি বলল, “অভাবের কথা আর যেই তুলুক আমি তুলিনি। অভাব বোধ করা আমার স্বভাব নয়। কেমন করে যে আমার সব অভাব মিটে যায় আমিই কি তা বুঝি! জীবন দেবতা সদয়।”

তারপর তাদের কথাবার্তা আর একটু অন্তরঙ্গ পর্যায়ে উঠল। তন্ময় বলল, “আমার পরিকল্পনা মোটের উপর তেমনি আছে। বিলেত যাব, বিলেত থেকে ফিরে একটা কাজকর্ম জুটিয়ে নেব। বিয়ে করব, ঘর সংসার পাতব। তবে কাকে বিয়ে করব এখন তা ঠিক হয়ে গেছে। রূপমতীকে।”

“এটা জীবনমোহনের ঘটকালিতে।” এই বলে কান্তি হেসে আকুল হলো।

“এখন কেবল একটা নিমন্ত্রণপত্র বাকী।” টিপ্পনী কাটল অনুত্তম।

“তোদের কেবল হাসি, কেবল ঠাট্টা!” তন্ময় কপট রোষ প্রকট করল।

“তার পর, সুজন, তুই চুপ করে রইলি যে! বোধ হয় ভাবছিস কাকে বিয়ে করা উচিত তা ঠিক হয়ে গেছে, কিন্তু তার বাপের মত নেই আর সে নিজে পর্দার আড়ালে।” কান্তি পরিহাস করল।

“না, পর্দার আড়ালে সে নয়। ছাতার আড়ালে সুজন।” রহস্য করল অনুত্তম।

"তা হলে," তন্ময় ফূর্তি করে বলল, "আমাকেও হাটে হাঁড়ি ভাঙতে হচ্ছে। এই নীল চশমাটি কিসের জন্যে? বেড়াল চোখ বুজে দুধ খায় আর ভাবে কেউ টের পাচ্ছে না।"

সুজন শেষে মুখ ফুটে বলল, "না, আমার পরিকল্পনায় বিয়ের জন্যে স্থান সংরক্ষিত নেই। বিয়ে যদি হয়ে যায় তো হয়ে যাবে একটা আকস্মিক ঘটনার মতো। আমিও আশ্চর্য হব। তোরাও হবি। আকস্মিকের জন্যে তখন জায়গা ছেড়ে দিতে হবে!"

কান্তি রসিয়ে রসিয়ে বলল, "তার মানে, ন্যাড়া, খাবি? না হাত ধোব কোথায়?"

অনুত্তম গম্ভীর ভাবে বলল, "ছাঁদনাতলায়।"

হেসে উঠল চার জনেই। সুজন স্বয়ং।

এর পরে এলো অনুত্তমের পালা। তন্ময় বলল, "অনুত্তম যাই বলুক না কেন আমি বিশ্বাস করব না যে ও চিরকাল দেশের কাজ নিয়ে থাকবে।"

"কে বলল চিরকাল দেশের কাজ নিয়ে থাকব?" অনুত্তম প্রতিবাদের সুরে বলল, "দেশ যতদিন পরাধীন ততদিন দেশের কাজ আমার পরিকল্পনার প্রধান অংশ নেবে। তার পরে যেমন সর্বত্র হয়ে থাকে তেমনি এখানেও হবে। সৈনিক ফিরে যাবে নিজের কাজে। আমি কেন ধরে নেব যে দেশ চিরদিন পরাধীন থাকবে? স্বাধীন ভারত আমাদেরই হাত দিয়ে হবে।"

"তার পরে তুই কী করবি? ঘরসংসার? বিয়ে?" প্রশ্ন করল তন্ময়।

"করতেও পারি," উত্তর দেয় অনুত্তম। "করতে আমার অনিচ্ছা নেই যদি ঝড়ের রাতের চলবিদ্যুৎকে বাতিদানের স্থিরবিদ্যুতে পরিণত করার কৌশল জানি। কিন্তু বিদ্যুৎ যদি তার বিদ্যুৎপনা হারায় তা হলে তাকে নিয়ে আমি কী করব। বিয়ে যারা করে তারা

বিদ্যুৎকে করে না, খদ্যোতকে করে। বিদ্যুৎ আপনি খদ্যোত হয়ে যায়। সেইজন্যে আমি ও কথা ভাবতে চাইনে, তন্ময়।"

এর পরে কান্তি। "কান্তি তো বিয়ে করবে না বলে ঘোষণা করেছে। ওকে মেয়েদের সঙ্গে মিশতে দেওয়া উচিত নয়।" তন্ময় বলল বিজ্ঞ সমাজপতির মতো।

"বটে!" কান্তি খোশ মেজাজে বলল, "মেয়েরা তা হলে মিশবে কার সঙ্গে? বিয়ে তো মাত্র একজনের সঙ্গে হয়। সেই একজন ছাড়া আর কারো সঙ্গে মিশতে পারবে না?"

তন্ময় সহসা উত্তর খুঁজে পেলো না। সুজনের দিকে তাকালো। সুজন বলল, "কান্তির পরিকল্পনায় বিয়ের জন্যে স্থান নেই; আকস্মিকের জন্যেও সে জায়গা রাখেনি। কিন্তু নারীর জন্যে আসন আছে। তন্ময়ের এটা ভালো লাগছে না। অনুত্তম তো একে স্বৈরাচার বলেছে। আমি নীতিনিপুণ নই, তবু আমারও কী জানি কেন কোথায় যেন বাধছে। কান্তি, আমি তোকে বিচার করতে চাইনে। কিন্তু কথাটা একটু ভেবে দেখিস্।"

কান্তি ভাবুকের মতো মুখ করে বলল, "তোদের তিন জনেরই মনের কথা এই যে নারী তোদের জন্যে নীড় বাঁধে। যে পাখী আকাশের সে হয় নীড়ের। উড়ে যার সুখ সে উড়তে ভুলে যায়। নারীর নিজের মনের কথা কিন্তু তা নয়।"

অনুত্তম মস্করা করে বলল, "শোনো, শোনো।"

তন্ময় বলল, "আচ্ছা, শুনি।"

কান্তি বলল, "আমাদের চারজনের পরিকল্পনায় সঙ্গতি থাকলে খুশি হতুম আমিই সব চেয়ে বেশি! কিন্তু তা হবার নয়। তবে আমাদের চারজনেরই জীবনের মূলসূত্র এক। কী বলিস্, সুজন?"

সুজন কান্তিকে দুঃখ দিতে চাইল না। বলতে পারত, স্বৈবাচার তো মূলসূত্রবিরোধী। বলল, "মোটামুটি এক।"

"তবে আর কী!" কান্তি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "বিদায়ের দিন এই কথাটাই মনে থাকবে আমাদের যে আমরা সব রকমে স্বাধীন, তবু একসূত্রে গাঁথা। সেই অদৃশ্য সূত্রই আবার আমাদের টেনে নিয়ে আসবে যেমন করে টেনে আনে আকাশ থেকে ঘুড়িকে।"

"হ্যাঁ, আবার আমরা মিলব।" বলল অনুত্তম।

"মিলব এক দিন না একদিন। হয়তো দশ বছর পরে।" বলল সুজন।

"হয়তো কেন?" তন্ময় বলল তার স্বভাবসিদ্ধ ঐকান্তিকতার সঙ্গে। এখন থেকে একটা দিন ফেলা যাক। এটা ১৯২৪ সাল। ঠিক এক দশক পরে ১৯৩৪ সালে আমরা যে যেখানে থাকি এইখানে এসে মিলিত হব। এই সাগরতীরে। এই আষাঢ় পূর্ণিমায়।"

"সে কি সম্ভব?" অনুত্তম আপত্তি জানালো। "যদি জেলে থাকি সে সময়?"

"তার আগেই" সুজন বলল প্রত্যয়ভরে, "দেশ স্বাধীন হয়ে থাকবে।"

"বলা যায় না। যে শক্তির সঙ্গে আমাদের বিরোধ তার হাতে কেবল অস্ত্রবল আছে তা নয়, তার পাতে বিস্তর রুটির টুকরো মাছের কাঁটা। গোটাকয়েক ছুঁড়ে ছড়িয়ে দিলে আমাদেরই মধ্যে কামড়া-কামড়ি বেধে যাবে। অনায়াসে আরো দশ বিশ বছর।"

"বেচারা অনুত্তম!" কান্তি দরদের সঙ্গে বলল, "তোর জন্যে সত্যি খুব দুঃখ হয়। কেন যে তুই নামতে গেলি পলিটিক্সে।"

"তা হলে এখন থেকে দিনক্ষণ স্থির করে ফল নেই," তন্ময় বলল নিরাশার সুরে। "তবে চেষ্টা করতে হবে দশ বছর পরে মিলতে। কেমন, রাজী?"

"আচ্ছা।" বলল অনুত্তম, সুজন, কান্তি।

"তবে," কান্তি এটুকু জুড়ে দিল, "তন্ময়ের তন্ময়িনী আর সুজনের সুজনিকা এঁদের 'আচ্ছা'র উপর নির্ভর করছে আমাদের 'আচ্ছা'। কী বলিস্, অনুত্তম?"

"তুইও যেমন! ভেবেছিস্ এ জন্মে ওদের বৌ জুটবে?" অনুত্তম বলল সংশয়ের সুরে। "জীবনমোহন যা ক্ষেপিয়ে দিয়েছেন তার জের চলবে জীবনভোর। আমার আশঙ্কা হয় এ অন্বেষণ ভারতের স্বাধীনতার চেয়ে আরো কঠিন, আরো সময়সাপেক্ষ।"

বেচারা তন্ময়! সে কী যেন বলতে চেয়েছিল, বলতে পারল না। গলায় পাথর চাপা।

তখন সুজন বলল,

"মরব না কেউ তন্ময়িনী সুজনিকার শোকে।
রূপমতী কলাবতী আছেন মর্ত্যলোকে।"

তা শুনে সকলে হেসে উঠল। এবার তন্ময় তার বাক্‌শক্তি ফিরে পেলো। বলল, "এখন থেকে যে যার নিজের ইষ্টদেবীর ধ্যান করবে। কার কপালে কী আছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। পুরুষস্য ভাগ্যম্। কে জানে হয়তো আমার রূপমতী পৃথিবীর ওপিঠে আছে। ওপিঠে গেলেই দেখতে পাব।"

"ওপারেতে সব সুখ!" অনুত্তম ব্যঙ্গ করল।

"থাক, থাক। ও প্রসঙ্গ আর নয়।" কান্তি ওদের থামিয়ে দিল। "এখন থেকে আমরা স্বতন্ত্র। সত্যি কেউ কি জোর করে বলতে পারে কার বরাতে কী জুটবে—পূর্ণতা কি শূন্যতা কি মামুলি এক উকীল-দুহিতা, সঙ্গে বারো হাজার টাকা পণযৌতুক!"

আর এক দফা হাসির ঢেউ উঠল। "তোর ভ্যালিউয়েশন বড় কম হয়েছে। তন্ময় কখনো ব্যারিস্টারের নিচে নামবে না, যদি নামে তবে বত্রিশের কমে নয়। মানে বত্রিশ হাজারের।" বলল অনুত্তম।

"অনুত্তম," তন্ময় হাসতে হাসতে বলল, "তুই তোর নিজের চরকায় তেল দে। ঐ চরকার দৌলতে যদি স্বরাজ হয় তা হলে স্বরাজের দৌলতে তোরও একটা হিল্লে হয়ে যাবে। বিনা পণে বিয়ে করবি সে আমি লিখে দিতে পারি। কিন্তু শ্বশুর নির্বাচনে কৃতিত্বের পরিচয় দিবি। কোনো এক সর্বত্যাগী দর্লপতি যাঁর দুয়ারে বাঁধা হাতী।"

"এখন থেকে আমরা স্বতন্ত্র।" কান্তির এই উক্তির পুনরুক্তি করল সুজন। "কাজেই ও প্রসঙ্গ থাক। তা ছাড়া জীবনমোহনের কাছে আমরা যে অঙ্গীকার করেছি তার সঙ্গে ও প্রসঙ্গ মানায় না। লক্ষ্য আমাদের উচ্চ। আমাদের উঠতে হবে সেই উচ্চতায়। আমি তো দেখছি আমাদের প্রত্যেকের ভাগ্যে দুঃখ আছে। এসব হালকা কথার দ্বারা কি দুঃখকে উড়িয়ে-দেওয়া যায়! তার চেয়ে বল, আমরা দুঃখের জন্যে প্রস্তুত, কিন্তু আমরা রাজপুত্র। রাজকন্যা ভিন্ন আর কাউকে বিয়ে করব না, করতে পারিনে। তার অন্বেষণেই আমাদের যাত্রা। আর কারো অন্বেষণে নয়।"

তন্ময়ের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কোনো মতে বলল, "সুজন, তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তোকে আমি মিস্ করব।"

"হে সুজন, শ্রীকান্তির লহ নমস্কার। আমাদের বাণীমূর্তি তুমি।" কান্তি তাকে হাত তুলে নমস্কার করল।

আর অনুত্তম? সে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, "জীতা রহো।"

অবশেষে সেই রাতটি এলো যার পরের দিন তাদের যাত্রা। চার কুমার চারদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দেবে। কেউ কারো দিকে ফিরে তাকাবে না। পিছনে পড়ে থাকবে এই বৃক্ষ—এই পুরীর সিন্ধুতীর।

বার বার চোখে জল এসে পড়ে, গলা ভারী হয়ে যায়, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ওঠে। একজন আরেক জনের হাত চেপে ধরে, ছেড়ে দেয় না। উদাস কণ্ঠে বলে, "আবার কবে আমাদের দেখা হবে? কবে? কোন

অবস্থায় ?”

“মনে রাখিস্। ভুলে যাস্‌নে।” তন্ময় বলল কান্তিকে। “তোর যা ভোলা মন।”

“চিঠি লিখিস্, যেখানেই থাকিস্।” অনুত্তম বলল তন্ময়কে। “তোর যা কুঁড়ে হাত।”

“লেখাটেখা কাগজে ছাপা হলে মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দিস্।” কান্তি বলল সুজনকে। “তোর যা লাজুক স্বভাব।”

“এবার তো গান্ধী ফিরেছেন। গ্রামে গিয়ে কাজ করতে বলবেন। কলকাতায় এলে খবর দিস্।” সুজন বলল অনুত্তমকে। “তোর যা অফুরান ব্যস্ততা।”

চার জনে চার জনকে কথা দিল, “নিশ্চয়। নিশ্চয়। সে আর বলতে!”

কিন্তু কথা দিলে কী হবে! প্রত্যেকেই মনে মনে বুঝল যে কথা দেওয়া সহজ, কথা রাখা কঠিন। তারা যে ঘাটের নৌকা। ঘাট ছেড়ে ভাসতে শুরু করলে কে যে কোথায় ভেসে যাবে নিজেই জানে না। যোগাযোগ রাখবে কী! তবু বলতে হয়, “নিশ্চয়। নিশ্চয়।”

পরিকল্পনাও কি ঠিক থাকবে? মূলসূত্র। তার কি কোন এদিক ওদিক হবে না? হরি! হরি! মানুষ করবে জীবনের উপর খোদকারী! তবু ওরা পরস্পরকে আশ্বাস দিল যে ওদের এত কালের জল্পনা কল্পনা আলাপ আলোচনা ব্যর্থ হবে না। এত পরিশ্রম করে যে ভিত গড়া হয়েছে তার গাঁথুনি পাকা।

“কে কী পাবে না পাবে, করবে না করবে, হবে না হবে, কেউ জোর করে বলতে পারে না। কিন্তু আমরা বোধ হয় গর্ব করে বলতে পারি যে আমাদের জীবনের বনেদ কাঁচা নয়। কী বলিস্ রে, সুজন?”

“যা বলেছিস্, অনুত্তম।”

“কান্তির কী মনে হয়?”

"আমারও তাই মনে হয়।"

"তন্ময় ?"

"আমিও সেই কথা বলি।"

চার জনে চার জনের হাতে রাখী বাঁধে। যদিও রাখীপূর্ণিমার দেরি আছে।

তার পরে উঠল যে কথা তাদের সকলের মন জুড়ে রয়েছে, অথচ একান্ত নিভৃতে। রাজকন্যার কথা।

"অতীত ব্যর্থ হয়নি, কিন্তু ভবিষ্যৎ ব্যর্থ হবে," বলল সুজন, "যদি রাজকন্যার অন্বেষণ ছেড়ে অন্যের অন্বেষণ ধরি।"

"যেমন অন্নের অন্বেষণ।" কান্তি ইঙ্গিত করল।

"কিংবা ক্ষমতার।" তন্ময় মন্তব্য করল।

"কিংবা সুখের।" অনুত্তম সতর্ক করে দিল।

কথা যখন নিবে আসছে কথার সলতে উসকে দেয় সুজন। "যাকে আমরা খুঁজতে যাচ্ছি সে হয়তো হাতের কাছে। হয়তো পৃথিবীর ওপিঠে। আমি তাকে হাতের কাছেই খুঁজব। তন্ময় খুঁজবে দেশ-দেশান্তরে।"

"আর আমি খুঁজব," কান্তি বলে, "রামধনুর রঙে। সব ক'টা রঙ এক ঠাঁই থাকে না। সব ঠাঁই মিলে এক ঠাঁই।"

"আর আমি খুঁজব সঙ্কটের সংঘাতের মধ্যে। দৈনন্দিনের মধ্যে নয়।" অনুত্তম বিপ্লবের আভাস দেয়।

আবার সুজন অগ্রণী হয়। "লক্ষ্যের 'পর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে। যেমন ছিল অর্জুনের দৃষ্টি। দ্রোণ যখন পরীক্ষা করলেন যুধিষ্ঠির বললেন, পাখী দেখছি। অর্জুন বললেন, পাখীর চোখ দেখছি। পাখী দেখতে পাচ্ছিনে। তেমনি আমরাও অনেক কিছু দেখতে পাব না। অনেক কিছু দেখলে আসল লক্ষ্যটাই ধোঁয়া হয়ে যাবে।"

"সেইটেই হলো ভয়ের কথা।" তন্ময় বলে কান্তির দিকে ফিরে।

"সত্যি তাই।" কান্তি কবুল করে।

"আমার সে ভয় নেই। কেননা আমি যে পরিস্থিতিতে তাকে দেখতে পাব সে পরিস্থিতির জন্যে দেশকে তৈরি করছি।" ইতি অনুত্তম।

রাত অনেক হয়েছিল। সমস্ত রাত জাগলেও কথা কি ফুরোবার! তন্ময় থাকে হোটেলে। তাকে গা তুলতে হলো। অগত্যা আর তিন জনকেও। এই তাদের শেষ রাত্রি, অনির্দিষ্ট কালের জন্যে। বিজয়ার দিন যেমন করে তেমনি কোলাকুলি করে তারা বিদায় নিল ও দিল।

"আবার দেখা হবে।" সকলের মুখে এক কথা। "যেন সঙ্গে দেখি রূপমতী কলাবতী পদ্মাবতী কান্তিমতীকে।"

চারজনে চারখানা রুমাল ভাসিয়ে দিল সমুদ্রের জলে। "এই রইল নিশান।" তার পরে চার ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

কলাবতীর অন্বেষণ

বন্ধুরা চলে গেল যে যার রাজকন্যার অন্বেষণে। কেউ দক্ষিণ ভারত, কেউ সাবরমতী, কেউ বিলেত। সুজন ফিরে গেল কলকাতা। তার রাজকন্যার অন্বেষণে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হতে হবে না। ট্যামার লেনের মাইল খানেক উত্তরে তার রাজকন্যার মায়াপুরী। মানে ছোট একখানা চাঁপা রঙের বাড়ী।

চাঁপা রঙের বাড়ীতে থাকে বকুল নামে মেয়ে। বেথুন কলেজে পড়ে। ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় ব্রহ্মসঙ্গীত গায়। সুজনের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে আলাপ। সুজনকে ডাকে সুজনদা। সুজিদা। সুজি। ময়দা। ছোটবোনের মতো।

বকুল কিন্তু জানে না যে সুজন তাকে পূজা করে। বকুল জানে না, তন্ময় জানে না, অনুত্তম কান্তি এরাও জানে না। জানে কেবল পূজারী নিজে। জানলে কী হবে, তার নিজের মন নিজের কাছেও স্বচ্ছ নয়। কেমন স্বপ্নের মতো মনে হয় বকুলের সঙ্গ, বকুলের কথা, বকুলের গান। সে কি কাছে না দূরে? যোজন যোজন দূরে। মাটিতে না আকাশে? সাঁঝের আকাশে। সে কি মানুষ না তারা? সন্ধ্যাতারা।

সুজন তার মনের কথা মনে চেপে রাখে। মুখ ফুটে জানায় না। কিন্তু চোখেরও তো ভাষা আছে। পড়তে জানলে চাউনি থেকেও বোঝা যায়। বকুল কি বোঝে না? কী জানি! হয়তো বোঝে, কিন্তু ভাবে না, ভাবতে চায় না। সে তার নিজের জগতে বাস করে। তার নিজের ভাবলোকে। সেখানে আছে গান আর গুঞ্জরণ আর স্বরসাধনা। আছে বই পড়া আর পরীক্ষা পাশ করা। আছে সামাজিকতা আর পারিবারিক কর্তব্য।

আর পূজা কি তাকে ওই একজন করে!

সুজন জানে ওর আশা নেই। সেইজন্যে আরো জোরে রাশ টানে। চিত্তবৃত্তিকে অসম্ভবের অভিমুখে ছুটতে দেয় না। সে পূজা করেই ক্ষান্ত। প্রেম তার কাছে নিষিদ্ধ রাজ্য। ভালোবাসতে তার সাহস হয় না। দেবীকে ভালোবাসবার স্পর্ধা কোন পূজারীর আছে! সুজন একটু দূরে দূরেই থাকে। রবিবারে রবিবারে ব্রাহ্মসমাজে যায়। কোনো বার বকুলের নজরে পড়ে, কোনোবার পড়ে না। কিন্তু মাঘোৎসবে মিলেমিশে মন্দির সাজায়। সেই ছেলেবেলার মতো। তখন তো সুজনও গান করত।

পুরীতে চার বন্ধুর মিলিত হবার আগে এই ছিল সুজনের অন্তরের অবস্থা।

তার পর বন্ধুদের সঙ্গে ভাববিনিময়ের ফলে স্থির হয়ে গেল জীবনভোর সে একজনের অন্বেষণ করবে। তার নাম কলাবতী। জীবনে আর কারো অন্বেষণ নয়। . কলবতী কে? বকুল। বকুলের মধ্যেই কলাবতী আছে। খুঁজতে হবে সেই কলাবতীকে। সুজনের অন্বেষণ দেশ থেকে দেশান্তরে নয়। প্রতিমা থেকে প্রতিমার অভ্যন্তরে। পূজারী হবে ধ্যানী। হবে সাধক। দেবী হবে শাশ্বতী নারী। চিরসৌন্দর্যের প্রতীক।

পুরী থেকে যে ফিরে এলো সে আরেক সুজন। বাইরে থেকে বোঝা যায় না তফাৎ। বড় জোর এইটুকু বোঝা যায় যে তার ছাতাখানা হারিয়ে গেছে। এখন তাকে ছাতা মাথায় পথ চলতে দেখা যায় না। আগে তো ছাতা মাথায় ছবিও তোলাত। সারা কলেজে সে ছিল একচ্ছত্র। সে সব দিন গেছে। তন্ময়ও নেই, কান্তিও নেই, অনুত্তমও নেই। সুজন এখন একা। নতুন কোনো বন্ধুও জুটছে না তার। অবশ্য আলাপীর লেখাজোখা নেই।

মাঝে মাঝে জীবনমোহনের সঙ্গে দেখা করতে যায়। মুখ ফুটে বলতে পারে না কী ভাবছে, কী অনুভব করছে। বলতে হয় না।

তিনি বুঝতে পারেন। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখতে পান। উৎসাহ দেন।

"তুমি যাকে খুঁজছ", জীবনমোহন বলেন, "সে তোমার হাতের কাছে। কেন তুমি তীর্থ করতে যাবে, কেন যাবে হিমালয়ে! তোমার বন্ধুরা গেছে, যাক। তাদের জন্যে ভেবো না। তাদের তুলনায় নিজেকে ভাগ্যহীন মনে কোরো না। কার্ত্তিক তো ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এলো। এসে দেখল গণেশ তার আগে পৌঁছে গেছে। অথচ গণেশকে কোথাও যেতে হয়নি। কেবল মা'র চার দিকে একবার পাক দিয়ে আসতে হয়েছে।"

সুজন বল পায়। মনে মনে জপ করে, এই মানুষেই আছে সেই মানুষ। এই নারীতেই আছে সেই নারী। তার সন্ধান জানতে হবে।

সন্ধানের জন্যে সে রাজ্যের বই পড়ল। দেশী বিদেশী কোনো সাহিত্য বাদ গেল না। শুধু সাহিত্য নয়, দর্শন। শুধু দর্শন নয়, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সেকালের ও একালের ভ্রমণবৃত্তান্ত। তার পর রাজ্যের ছবি দেখল। মূর্তি দেখল। স্টুডিওতে স্টুডিওতে ঘুরল। অবনী ঠাকুর, নন্দলাল বসু, যামিনী রায়ের ওখানে হানা দিল। তার পর গান বাজনার আসরে ও জলসায়, ইউরোপীয় সঙ্গীতের রিসাইটাল-এ হাজির হলো। রাজ্যের গ্রামোফোন রেকর্ড কিনে শেষ কপর্দকটি খরচ করল।

আর বকুল? বকুল জানত না যে সুজন তার জন্যে দুশ্চর তপস্যা করছে। সে তপস্যা ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে যোগাসনে বসে নয়, চোখ কান প্রাণ মন খোলা রেখে যোগাযোগ স্থাপন করে। বকুলের সঙ্গে দেখাশোনা সাত দিন অন্তর হতো, যেমন হচ্ছিল। কিন্তু উপাসনার পর আলাপ বড় একটা হতো না। দু'জনেই অন্যমনস্ক।

দু'জনেই? হাঁ। ওদিকে বকুলেরও অন্য ভাবনা ছিল। বি.এ. পাশ করার পর তার আর পড়াশুনায় আগ্রহ ছিল না। সে চায়

সঙ্গীত নিয়ে থাকতে। কিন্তু তার গুরুজনের সায় নেই। তাকে হয় মাস্টারি করতে হবে, নয় বিয়ে করতে হবে। দুটোর মধ্যে একটা বেছে নিতে সময় লাগে। সে সময় নিচ্ছিল। তার হাতে সময় ছিল। তার সময়ের সুযোগ নিচ্ছিল সুজনের সমবয়সী উদ্যোগী যুবকরা। কেউ সন্ধ্যাবেলা গিয়ে গান শুনতে বসত। কেউ দুপুরবেলা গিয়ে স্বরলিপি লিখে দিত। সুজন এদের এড়িয়ে একা বকুলের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে কি দেখা পেতো? দু' একবার চেষ্টা করে দেখেছে, এদের দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ হয়ে ফিরে এসেছে। বাক্যবাণেও। নির্দোষ পরিহাসকেও সে ব্যক্তিগত আক্রমণ মনে করে সংকুচিত হতো।

সুজন এক দিন শুনতে চেয়েছিল অতুলপ্রসাদের "আ মরি বাংলা ভাষা।" বকুল মুখ খোলবার আগেই একজন শুরু করে দিল, "মোদের খোরাক মোদের পুঁজি আ মরি ময়দা সুজি!" বেচারা সুজন তা শুনে অপমানে রাঙা হয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

সুজন যদি একটু কম লাজুক হতো, যদি একখানা চিঠি লিখে একটুখানি আভাস দিত তা হলে কী হতো বলা যায় না। কিন্তু বকুলের জীবনের সন্ধিক্ষণে সুজনের এই আত্মগোপন দু'জনের একজনেরও পক্ষে কল্যাণকর হলো না। বকুল শেষপর্যন্ত বিয়ের দিকেই ঝুঁকল। তবে এখন নয়, এখন বাগ্‌দান। ছেলেটি বিলেত যাচ্ছিল, বকুলের আঙুলে আংটি পরিয়ে দিয়ে গেল। এক দিন সুজনের চোখে পড়ল সে আংটি। বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে এলো, কিন্তু তাড়াতাড়ি সুজন সেখান থেকে সরে গেল।

কিন্তু তার তপস্যায় ছেদ পড়ল না। বিয়ে? বিয়ে এমন কী বাধা যে তার দরুণ অন্বেষণ ব্যর্থ হবে? বিয়ের পরেও বকুল বকুলই থাকবে, কলাবতী কলাবতীই থাকবে। বিয়ে না করলেও যা বিয়ে করলেও তাই। সুজন গভীর আঘাত পেলো, কিন্তু আঘাতকে উপেক্ষা করল। মনে মনে জপ করল, 'আরো আঘাত সইবে আমার,

সইবে আমারো।'

বাগ্‌দানের পর বকুল চলে গেল শান্তিনিকেতন। সেখানে সঙ্গীতচর্চা করতে। এটা তার ভাবী পরিণেতার ইচ্ছায়। সুজনের সঙ্গে দেখা হলো না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেল। তবু সুজনের তপস্যায় ছেদ পড়ল না। অদর্শন? অদর্শন এমন কী বাধা যে তার জন্যে অন্বেষণ বন্ধ হবে? দৃষ্টির অন্তরালেই বকুল বকুলই থাকবে, কলাবতী কলাবতীই থাকবে। সুজন কি দিনের বেলা সন্ধ্যাতারা দেখতে পায়? তা বলে কি সন্ধ্যাতারা সন্ধ্যাতারা নয়? সুজন গভীর আঘাত পেলো, কিন্তু কাতর হলো না। মনে মনে জপ করল, 'এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায় সেই কথা বলিয়ো।'

পূজার বন্ধে বকুল বাড়ী এলো। ব্রাহ্মসমাজেও তাকে আবার দেখা গেল। সুজন তাকে দেখে স্বর্গ হাতে পেলো। চোখের দেখাও যে মস্ত বড় পাওয়া। এ কি উড়িয়ে দেওয়া যায়! কলাবতী কি কেবল ধ্যানগোচর? চক্ষুগোচর নয়? দেবতা কি কেবল নিরাকার? সাকার নন? আত্মপরীক্ষা করে সুজন হৃদয়ঙ্গম করল যে নিরাকার উপাসনার মতো সাকার উপাসনাও চাই। নইলে এত লোক দর্শন করতে যেত না।

বকুল আবার অদর্শন হলো। এমনি চলতে থাকল কয়েক বছর। এম. এ. পাশ করে সুজন হলো একখানা বিখ্যাত মাসিকপত্রের সহকারী সম্পাদক। তার তপস্যা তাতে আরো জোর পেলো। এত দিন যাকে পড়তে পড়তে দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে খুঁজছিল এখন থেকে তাঁকে খুঁজতে লাগল লিখতে লিখতে। ঠিক যে এখন থেকে তা নয়। আগেও তো সে লিখত। তবু এখন থেকেই। কেননা এই পরিমাণ দায়িত্ব নিয়ে লেখেনি এর আগে।

বকুল কেমন করে টের পেলো তার জন্যে একজন সাধনা করছে। বোধ হয় দেবতারা যেমন করে টের পান যে মর্ত্যে তাঁদের ভক্তরা

তাঁদের এক মনে ডাকছে। এক দিন খুব একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। বকুলের দিদি পারুল ডেকে পাঠালেন সুজনকে। পারুলদির ওখানে সে বকুলকে দেখবে আশা করেনি। গল্প করতে করতে রাত হয়ে গেল। পারুলদি কখন এক সময় উঠে গেলেন তাদের দু'জনকে একা রেখে। বেশ কিছুক্ষণ একা ছিল তারা।

এই সুযোগই তো এক দিন অভীষ্ট ছিল সুজনের। অবশেষে জুটল। কিন্তু জুটল যদি, মুখ ফুটল না। বোবার মতো, বোকার মতো বসে রইল সুজন। একটি বার বলতে পারল না, "ভালোবাসি।" সুধাতে পারল না, "তুমি আমার হবে?" বকুল যেন নিঃশ্বাস রোধ করে মিনিট গুনছিল, সেকেন্ড গুনছিল। আজ তার জীবনের একটা দিন। বাগ্দান ভঙ্গ করা অন্যায়। কিন্তু বকুলকে যারা চেনে যারা জানে তারা তাকে ক্ষমা না করে পারত না। এমন কি স্বয়ং মোহিত ক্ষমা করত তাকে। বকুল এমন মেয়ে যে তার উপর রাগ করে থাকা যায় না।

সুন্দরী? হাঁ, সুন্দরী বটে। কিন্তু রূপ তার দেহের নয় ততটা, অন্তরের যতটা। মুখে চোখে আলো ঝলমল করছে। সে আলো কোন অদৃশ্য উৎস থেকে আসছে কত লক্ষ কোটি যোজন দূর থেকে। মাঝে মাঝে তার উপর ছায়া পড়ছে। সামাজিকতার ছায়া। তখন মনে হচ্ছে এই বকুল কি সেই বকুল! ছায়া সরে যাচ্ছে। গান আসছে তার কণ্ঠে। তখন মনে হচ্ছে, এই তো আমাদের চির দিনের বকুল। এই অচেনাকে চেনার শিকলে কে বাঁধবে! বকুল, তুমি স্বর্গের দ্যুতি। তুমি দিব্য।

সুজন তাকে বিনা বাক্যে বন্দনা করল। কিন্তু কোনো মতেই বলতে পারল না যে সে যেন সুজনের হয়। অন্যের বাগ্দত্তা না হলে কথা ছিল। কিন্তু আজ বাদে কাল যার বিয়ে সে কি বর পরিবর্তন করতে রাজী হবে! তা ছাড়া আছেই বা কী সুজনের! অবস্থা ভালো

নয়। হবেও না কোনো দিন। সে সাহিত্য সৃষ্টি করেই জীবন কাটিয়ে দেবে শত অভাবের মধ্যে। বিয়ে তার জন্যে নয়। তাকে বিয়ে করা মানে দারিদ্র্যকে বিয়ে করা। বকুলের কেন তাতে রুচি হবে! বকুল, তোমাকে যেন মাঝে মাঝে দেখতে পাই। এর বেশি আশা করিনে। করতে নেই।

ওরা দু'জনে এত কাছাকাছি বসেছিল যে একজনের নিঃশ্বাস পড়লে আরেকজন শুনতে পায়। নিঃশ্বাস পড়ছিল অনেকক্ষণ বিরতির পর। সে বিরতি উৎকণ্ঠায় ভরা। আগে কথা বলার পালা সুজনের, কিন্তু সুজন যখন কিছুতেই মুখ খুলবে না তখন বকুলকেই অগ্রণী হতে হবে।

"তার পর, সুজিদা," বকুল বলল সকৌতুকে, "তুমি নাকি কার জন্যে তপস্যা করছ।"

"কে, আমি?" সুজন বলল চমকে উঠে। "তপস্যা করছি! কই, না!"

"হাঁ, সেই রকমই তো মালুম হচ্ছে।" হেসে বলল বকুল, "কিন্তু কোন দেবতার জন্যে? কোথায় তিনি থাকেন? স্বর্গে না মর্ত্যে? মর্ত্যেই যদি থাকেন তবে তো একখানা চিঠিপত্তর দিতে পারতে। বিল্বপত্তর, তুলসীপত্তর দিয়ে কী হবে?"

সুজন এর উত্তরে কী বলবে ভেবে পেলো না। বকুলের সঙ্গে তার যা সুবাদ তাতে একখানা কেন দশখানা চিঠি দেওয়া চলে। কিন্তু কী লিখবে চিঠিতে? লিখতে হাত কাঁপে। অথচ এই সুজনেরই লেখায় মাসিকপত্রের পৃষ্ঠা পূর্ণ।

"দিয়ো। বুঝলে?" বকুল একটু পরে বলল।

এই ঘটনার কয়েক মাস বাদে আর একটা ঘটনা ঘটে। তবে সেটা খুব একটা আশ্চর্য ঘটনা নয়। বকুলের বিয়ে। মোহিত বিলেত থেকে ফিরে কলম্বোতে চাকরি পেয়ে কলকাতা এসে বকুলকে বিয়ে

করে। কন্যাযাত্রীদের দলে সুজনকে দেখা যায়। তার বুক ফেটে যাচ্ছিল, ঠিকই। যদিও মুখ দেখে বোঝবার জো ছিল না।

এমন একজনও বন্ধু ছিল না যে তার মনের ভিতরটা দেখতে পায় বা যাকে সে তার মনের মণিকোঠার দ্বার খুলে দেখাতে পারে। কান্না ঠেলে উঠছে বুক থেকে চোখে, তবু তার চোখের কোণে জল নেই। আর পাঁচ জনের মতো সেও সুখী যে বকুলের বেশ ভালো বিয়ে হয়েছে। বকুল সুখী হবেই। না হয়ে পারে না। সুজনের সঙ্গে বিয়ে হলে কি পাঁচ জনে সুখী হতো? বরং এই ভেবে অসুখী হতো যে মেয়েটা কী ভুলই না করেছে।

বকুলের মা বাবা ভাই বোন সকলেই সুখী। কেবল পারুলদির ব্যবহার একটু কেমনতরো। শান্ত শিষ্ট সরল মানুষটি কেমন যেন থ' হয়ে গেছেন। বোধ হয় ভাবছেন এটা কি ঠিক হচ্ছে না ভুল হচ্ছে বকুলের? সে কি সত্যি পারবে সারা জীবন মোহিতের ঘর করতে? মোহিতের ছেলেমেয়ের মা হতে? পারবে না কেন? তবে খুশি হয়ে না দায়ে পড়ে? পারুলদি বার বার সুজনের দিকে তাকান আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

আর বকুল? সে চির দিন যেমন আজও তেমনি সপ্রতিভ। এটা যে একটা বিশেষ দিন, যাকে বলে জীবনে একটা দিন, এর জন্যে সে বিশেষ সুখী বা বিশেষ অসুখী বলে মনে হয় না। তার ভাবখানা যেন—বিয়ে হচ্ছে নাকি? আচ্ছা, হোক।

সে যেন সাক্ষী। নিষ্ক্রিয় সাক্ষী।

বকুলরা কলম্বো চলে যাবার পর সুজনের জীবনযাত্রায় তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা দিল না। কলাবতীর অন্বেষণ সমানে চলল। কলাবিদ্যায় বিদ্বান হয়ে উঠল সুজন। তার রচনায় মাধুর্য এলো, এলো প্রসাদগুণ, এলো ফোটা ফুলের সুষমা। আর অতি সূক্ষ্ম সুগন্ধ। পালিয়ে যাওয়া, মিলিয়ে যাওয়া, অ-ধরাছোঁয়া সুগন্ধ।

যারা পড়ে তারা হাতড়ে বেড়ায়, হাতে পায় না। বার বার পড়ে। মুগ্ধ হয়। চিঠি লিখে সুজনকে জানায় ধন্যতা।

চিঠি লেখে মেয়েরাও। সমবয়সী, অসমবয়সী, বিবাহিতা, অবিবাহিতা, দূরস্থিতা, অদূরস্থিতা। কেউ কেউ দেখা করতে চায়। দেখা করেও। অটোগ্রাফের ছলে। তর্কবির্তর্কের ছলে। সুজন উত্তর দেয় বৈকি। উত্তর দেয় দু'চার কথায়। কিন্তু হৃদয় ভেঙে দেখায় না। দেখাতে পারেও না।

বকুলকে, কলাবতীকে কেউ আচ্ছন্ন করবে না। সন্ধ্যাতারা ঢাকা পড়বে না কোনো নীলনয়নার কালো কেশপাশে। শাশ্বত সৌন্দর্য হতে ভ্রষ্ট হবে না ভ্রমর। বিয়ে করবে না সুজন। আজীবন? হাঁ, যত দূর দৃষ্টি যায়, আজীবন।

জীবন এমন কিছু দীর্ঘ নয়। তার মা বেঁচেছিলেন মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর। সেও হয়তো তেমনি বছর পঁয়ত্রিশ বাঁচবে। তাঁর বাবা জীবিত। মেদিনীপুরে কাজ করেন। সামনেই তাঁর অবসরগ্রহণ। কলকাতার বাসায় সুজন থাকে ছোট ভাইবোনদের নিয়ে। তারা পড়াশুনা করে। অভাবের সংসার। বিয়ের জন্যে চাপ দিচ্ছে না কেউ।

কলম্বোতে বকুল কেমন আছে কে জানে! খবর নেয়নি সুজন। চিঠি লিখতে পারত, কিন্তু কী লিখবে? বকুলও চিঠি লেখে না। কেনই বা লিখবে? ইচ্ছা করে পারুলদিকে জিজ্ঞাসা করতে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে গেলে তো। পূর্বের মতো ধর্মভাব নেই, কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে।

জীবনমোহনের কাছে যায়। তিনিই তার ধর্মযাজক। রবিবারেই সুবিধা। সন্ধ্যার দিকে বাড়ী থাকেন। সুজনকে সঙ্গ দেন। ধর্মের ধার দিয়ে যান না। অবশ্য লৌকিক অর্থে। কিন্তু যা নিয়ে আলোচনা করেন তা ধর্ম নয় তো কী!

"সুজন, তোমার কবিতায় রং লেগেছে।" বলেন জীবনমোহন। "লিখে যাও, দোস্ত। তুমি হবে বাংলার হাফিজ।"

সুজন তা শুনে সঙ্কোচ বোধ করে। কতটুকু তার অনুভূতির ঐশ্বর্য। সামান্য পুঁজি নিয়ে কারবারে নামা। তাও যদি ভাষায় ব্যক্ত করতে জানত! পনেরো আনাই অব্যক্ত থেকে যায়। নিজের অক্ষমতায় সে নিজেই লজ্জিত। সমালোচকরা বেশি কী লজ্জা দেবে। কিন্তু কেউ সুখ্যাতি করলে সে সঙ্কোচে মাটিতে মিশে যায়। বিশেষত জীবনমোহনের মতো জীবনরসিক।

"এ তোমার বুকের রক্ত। পাকা রং।" বলেন জীবনমোহন।

পারিবারিক পেষণে বাধ্য হয়ে সুজনকে মাসিকপত্রের কাজ ছেড়ে কলেজের চাকরি নিতে হলো। এ রকম তো কথা ছিল না। এটা তার পরিকল্পনার বাইরে। ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। যা ভয় করেছিল তাই। পড়া আর পড়ানো, খাতা দেখা আর প্রিন্সিপালের ফাইফরমাস খাটা, এই করে দিন কেটে যায়। রাতও। সৃষ্টি করবে কখন? ছুটির সময়ও ছুটি মেলে না। এগজামিন। বা অন্য কিছু। সুজনের লেখা কমে এলো, কমতে কমতে প্রায় বন্ধ হতে বসল। হাতও খারাপ হয়ে গেল পাঠ্যপুস্তক লিখে।

বিপদ কখনো একা আসে না। ঝাঁকে ঝাঁকে আসে। চাকরি হতে না হতেই আসতে লাগল বিয়ের সম্বন্ধ। একটার পর একটা সম্বন্ধ উল্টিয়ে দেবার ফলে বাপের সঙ্গে বাধল খিটিমিটি। তিনি পেনসন নিয়ে বেকার বসে আছেন। হাতে কাজ নেই। নিষ্কর্মা হলে যা হয়। প্রত্যেকের প্রত্যেকটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা চাই। কেন তুমি বিয়ে করবে না? লেখাপড়ায় ভালো, গৃহকর্মে নিপুণ, সুশ্রী, সচ্চরিত্র, ভদ্রলোকের মেয়ে। তার উপর কিছু পণযৌতুকও আছে। কেন তা হলে তোমার অমত? তোমরা ক'ভাই যদি বিয়ে না করো, যদি পারিবারিক তহবিলে কিছু আমদানি না হয় তা হলে ছোট বোন-

গুলির বিয়ে দেবে কী করে? ইতিমধ্যে যে রুস্তানিটা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ হবে কী উপায়ে?

এ যুক্তি খণ্ডন করা শক্ত। সুজন পারতপক্ষে বাপের ছায়া মাড়ায় না। বাবা আসছেন শুনলে চোঁচাঁ দৌড় দেয়। যঃ পলায়তি স জীবতি।

শেষ কালে তিনি তাকে ফাঁপরে ফেললেন। কোথায় একটি মেয়ে দেখতে গিয়ে কথা দিয়ে এলেন। সুজনকে জানতেও দিলেন না যে তার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। ছাপাখানায় গিয়ে শুনতে পেলো তার বিয়ের চিঠি ছাপা হচ্ছে। দেখে তার চক্ষুস্থির। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করবে তেমন বীরপুরুষ নয় সে। বাপের সামনে মুখ তুলে কথা কইতে জানে না। তা হলে কি বিয়েই করতে হবে তাকে? কলাবতীকে ভুলতে হবে?

কদাচ নয়। সেই দিনই সুজন তার প্রকাশকের সঙ্গে দেখা করে পাঠ্যপুস্তকগুলোর কপিরাইট বেচে দিল। তার পর রাতারাতি পাসপোর্ট জোগাড় করে চাঁদপাল ঘাটে জাহাজ ধরল লণ্ডনের। জাহাজ যাবে কলম্বো হয়ে। চিঠি লিখল বকুলকে।

কলম্বোর জাহাজঘাটে অপেক্ষা করছিল বকুল ও তার স্বামী। সুজনকে বলল, "চলো আমাদের সঙ্গে। জাহাজ ছাড়তে দেরি আছে।"

আবার যখন জাহাজে উঠল ততক্ষণে মোহিতের সঙ্গে সুজনের খুব জমে গেছে। বিলেতে কোথায় উঠবে, কী পরবে, কী খাবে, এই রকম একশো রকমের টুকিটাকি নিয়ে আলাপ। বকুল আশা করেছিল সুজন তার দিকে একটু মনোযোগ দেবে। কিন্তু যে জেগে ঘুমোয় তাকে জাগাবে কে? সুজন অমনোযোগের ভাণ করল। কিন্তু লক্ষ্য করল যে বকুলকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে।

এ সৌন্দর্য সাজপোশাকের নয়, প্রসাধনের নয়, দেহচর্যার তো নয়ই, রূপচর্যার নয়। এ কি তবে গন্ধর্ববিদ্যা অনুশীলনের ফল? কোনখানে এর উৎপত্তি? সঙ্গীতলোকে? যে সংগীত আকাশে

আকাশে, গ্রহতারায়, আলোকে আগুনে, বিশ্বসৃষ্টিতে? প্রাচীনরা যাকে বলতেন দ্যুলোকের সঙ্গীত?

অথবা এর মূল বিশুদ্ধ নির্মল মানবাত্মায়? যার আভা সব আবরণ ভেদ করে ফুটে বেরোয়? অক্ষয় অব্যয় অব্রণ। এ কি তবে অনির্বচনীয় আত্মিক সৌন্দর্য?

সুজন ভাবে, শেলী যাকে বলেছেন ইনটেলেকচুয়াল বিউটি সে কি এই নয়?

জাহাজ যখন ছাড়ি ছাড়ি করছে, জাহাজ থেকে দর্শকদের নামবার সময় হয়েছে, তখন বকুল বলল, "সুজিদা, মনে রেখো।" ইংরেজী করে বলল, "ফরগেট মি নট।"

কী যে ব্যাকুল বোধ করল সুজন! মনে হলো আর দেখা হবে না হয়তো। এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল জাহাজ থেকে, জাহাজঘাটের দিকে। ধীরে ধীরে আড়াল হয়ে গেল সব। ফুটে উঠল শুধু একখানি মুখ। সাঁঝের তারার মতো।

এই সেই কলাবতী, যার ধ্যান করে এসেছে সুজন। চিরন্তনী নারী। এর সৌন্দর্য যে উৎস থেকে আসছে তার নাম চিরন্তন নারীত্ব। পৃথিবীতে যখন একটিও নারী ছিল না, যখন পৃথিবীই ছিল না, তখনো তা ছিল। বিশ্ব যখন থাকবে না তখনো তা থাকবে।

সুজনের জাহাজ লণ্ডনে পৌঁছল। সেখানে সে একটা কাজ জুটিয়ে নিল। স্কুল ফর ওরিয়েণ্টাল স্টাডিস্ নামক প্রতিষ্ঠানে। সঙ্গে সঙ্গে পি.এইচ.ডি.র জন্যে থীসিস লিখতে উদ্যোগী হলো। দেশে ফিরতে তাড়া ছিল না। ইচ্ছাও ছিল না। ফিরে এলে আবার তো সেই বিয়ের জন্যে ঝোলাঝুলি শুরু হবে। বাপের সঙ্গে ঝগড়া!

সেই সুদূর প্রবাসের শূন্য মন্দিরে মনে পড়ে একখানি মুখ। চিরন্তনী নারী। শাশ্বত সৌন্দর্য। অমনি আর সকল মুখ মায়া হয়ে যায়। ইরেজ মেয়ের মুখ, ফরাসী মেয়ের মুখ, প্রবাসিনী বাঙালী

মেয়ের মুখ, কাশ্মীরী মেয়ের মুখ ছায়া হয়ে যায়, মায়া হয়ে যায়। সুজন মেশে তাদের সঙ্গে, মিশবে না এমন কোনো ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নেই তার। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে আড়াল হতে দেয় না তার সন্ধ্যা-তারাকে, তার বকুলকে। সে যে কলাবতীর অন্বেষণে বেরিয়েছে। আর কারো সন্ধানে নয়।

সুজন যখন ইংলণ্ডে যায় তার আগে তন্ময় সেখান থেকে চলে এসেছে। দুই বন্ধুর দেখা হলো না। শুনতে পেলো তন্ময় নাকি বিয়ে করেছে। কিন্তু কাকে, কবে, কোথায়, কী বৃত্তান্ত কেউ সঠিক বলতে পারে না। তন্ময়ের ঠিকানায় চিঠি লিখবে ভাবল। কিন্তু আর দশটা ভাবনার তলায় সে ভাবনা চাপা পড়ে থাকল।

রূপমতীর অন্বেষণ

বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে জীবনমোহনকে প্রণাম করে তন্ময় যাত্রা করল পশ্চিমমুখে। কানে বাজতে থাকল তাঁর শেষ উক্তি, "উত্তমা নায়িকার সাক্ষাৎ লাভ করো। জীবনে যা কিছু শেখবার যোগ্য সে-ই তোমাকে শেখাবে। অন্য গুরুর আবশ্যক হবে না।"

ইংলণ্ডে গিয়ে দেখল অক্স্ফোর্ডে তার জন্যে আসন রাখা হয়েছে। সুবিখ্যাত ক্রাইস্ট চার্চ কলেজ। সেখানকার সে আবাসিক ছাত্র। খেলোয়াড় সর্বত্র পূজ্যতে। দেখতে দেখতে তার এনগেজমেণ্ট ডায়েরি ভরে গেল আমন্ত্রণে আহ্বানে। টেনিস খুলে দিল বনেদী সমাজের দ্বার। যে দ্বার বিদ্বানের কাছেও বন্ধ থাকে।

যার দরুণ তার এত খাতির সেই খেলার উপর জোর দিতে গিয়ে অন্য কিছু হয় না। হয় না উত্তমা নায়িকার অন্বেষণ। অনায়াসে যাদের সঙ্গে ভাব হয় তাদের সঙ্গ তাকে ক্ষণকালের জন্যে আবিষ্ট করে। তার পরে রেখে যায় তীব্রতর তৃষা। কোথায় তার রূপমতী, কোথায় সেই একমাত্র নারী, যে ছাড়া আর কোনো নারী নেই ভুবনে।

এমনি করে বছর ঘুরে গেল। কেম্ব্রিজকে খেলায় হারিয়ে দিয়ে নাম কিনল যারা তন্ময় তাদের একজন। পক্ষপাতীদের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে হাতে ব্যথা ধরে গেল তার। র‍্যাকেটখানা বগলে চেপে স্কার্ফ গলায় ঘুরিয়ে বেঁধে ক্রীম রঙের ফ্ল্যানেল ট্রাউজার্স পরা ছ ফুট লম্বা দোহারা গড়নের নওজোয়ান বিশ্রাম করতে চলল প্যারিসে।

বিশ্রামের পক্ষে উপযুক্ত জায়গা বটে প্যারিস। সেখানেও খেলার জন্যে আহ্বান, আহারের জন্যে আমন্ত্রণ। খেলোয়াড়দের না চেনে কে। ছোট ছেলেরা পর্যন্ত তাদের ছবি কেটে রাখে। যেই রাস্তায়

বেরোয় অমনি কেউ না কেউ দু'তিন বার তাকায়, একটুখানি কাশে, তারপর কাছে এসে মাফ চায় ও বলে, আপনি কি সেই বিখ্যাত— ?

'মিথ্যে বলতে পারে না। স্বীকার করে। তখন কথাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় খেলোয়াড়রা এসে হাতে হাত মেলায় আর বলে যুদ্ধং দেহি। হাতে ব্যথা শুনেও কি কেউ ছাড়ে! এন্‌গেজমেণ্ট ডায়েরি আবার ভরে যায়। এবার শুধু টেনিস কোর্ট ও ক্লাব নয়। কাফে রেস্তোরাঁ কাবারে নাচঘর। ব্যথা ধরে যায় কোমরে ও পায়ে।

বনেদী ঘরের না হোক, ঘরের না হোক, কত স্তরের কত রকম রঙ্গিণীর সঙ্গে পরিচয় হলো তার! রূপের ঝলক, লাবণ্যের ঝিলিক, লাস্যের ঝলসানি লাগল তার নয়নে, তার অঙ্গে, তার মানসে, তার স্বপ্নে। কিন্তু কই, রূপমতী কোথায়! কোথায় সেই একমাত্র নারী, যে সূর্যের মতো প্রতিবিম্বিত হচ্ছে এই সব শিশিরবিন্দুতে, ঝিকিমিকি করছে এই সব মণিকণিকায়! এরা নয়, এরা কেউ নয়।

বিশ্রামের হাত থেকে বিশ্রাম নেবার জন্যে তাকে দৌড় দিতে হলো দক্ষিণ ফ্রান্সের রিভিয়েরায়। নীসের কাছে ছোট্ট একটি না-শহর না-গ্রাম। সেখানকার সমুদ্রের গাঢ় নীল তার চোখে নীলাঞ্জন মাখিয়ে দিল। আর সে কী হাওয়া! একেবারে ঘুমের দেশে নিয়ে যায়। ঘুমপাড়ানী গেয়ে শোনায় পাইন বন, জলপাই বন। শুয়ে শুয়েই কেটে যায় দিন। একটু কষ্ট করে খেতে বসতে হয়। এই যা কষ্ট।

ছুটি ফুরিয়ে যাবার পরেও তন্ময় ফিরে যাবার নাম করে না ইংলণ্ডে। অকারণে শুয়ে শুয়ে কাটায় রিভিয়েরায়। একজন ডাক্তারও পাওয়া যায় যে তাকে শুয়ে থাকতে পরামর্শ দেয়। যাতে তার ব্যথা সারে। মন বলে, সময় নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু মনের অতল থেকে ধ্বনি আসে, স্থির হয়ে থাকো। ঘুমন্ত পুরীর রাজপুত্রের মতো নিষ্কম্প, অতন্দ্র।

ঘুম পায়, তবু ঘুমোতে পারে না। শুয়ে থাকে, তবু ঘুমোয় না। এই ভাবে কত কাল কাটে। পাঁজির হিসাবে যা আড়াই মাস ঘুমন্ত পুরীর হিসাবে তা আড়াই বছর। জেগে থেকে তন্ময় যার ধ্যান করে সে কোন দেশের রাজকন্যা কে জানে! কোন যুগের তাও কি বলবার জো আছে! যুগনির্ণয়ের একটা সহজ উপায় বেশভূষা অঙ্গসজ্জা। কিন্তু তন্ময় যার ধ্যানে বিভোর সে দিগ্‌বসনা।

বড়দিন এসে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে উড়ে এলো এক ঝাঁক টুরিস্ট।

কেউ বা তাদের ফরাসী, কেউ ইংরেজ, কেউ আমেরিকান, জার্মান, ওলন্দাজ। এক দল ভারতীয় উঠল তন্ময়ের হোটেলে। দল ঠিক নয়, পরিবার। পাগড়ি আর দাড়ি দেখে মালুম হয় শিখ। বাপ আর ছেলে, মা আর দুই মেয়ে। এ ছাড়া একজন সেক্রেটারী ভদ্রলোক। ইনি বোধ হয় শিখ নন, তবে পাঞ্জাবী। যে টেবিলে তাঁদের বসতে দেওয়া হয়েছিল সেটি তন্ময়ের টেবিল থেকে বেশ কিছু দূরে। নানা ছলে সে তাঁদের লুকিয়ে দেখছিল। তাঁদের দৃষ্টি কিন্তু তার উপর পড়ছিল না। পড়লে কি সে খুশি হতো? না, সে লুকিয়ে থাকতেই চায়। এই প্রথম সে তার চেহারার জন্যে লজ্জিত হলো। এঁদের না দেখে কে তার দিকে তাকাবে!

সমুদ্রের ধারে যেখানে সাধারণত সে শুয়ে থাকত সেখানে যেতেও তার অরুচি। সেটা সকলের নজরে পড়ে। তা বলে তো ঘরে বন্ধ থাকা যায় না। তন্ময় তা হলে কী করবে? পালাবে? না, পালাতেও পা ওঠে না। ভাবল ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে আপনাকে গোপন করবে। কিন্তু শাদা মানুষের ভিড়ে কালো মানুষের মুখ ঢাকা পড়ে না। ভারী অস্বস্তি বোধ করছিল তন্ময়। কিন্তু তার চেয়েও অস্বস্তি বোধ করছিল তার টেবলের জনা কয়েক ভারতফের্তা শ্বেতাঙ্গ। তারাই তলে তলে ষড়যন্ত্র করে তাকে চালান করে দিল ভারতীয়দের টেবলে। হোটেলের ম্যানেজার স্বয়ং তাকে অনুরোধ

জানালেন তার স্বদেশীয়দের সঙ্গ দিয়ে তাঁকে অনুগৃহীত করতে।

শিখ ভদ্রলোক তাকে বিপুল সমাদরে গ্রহণ করলেন ও পরিবার পরিজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। বললেন, "আমাদের মহারাজা ফরাসী সভ্যতার পরম ভক্ত। ফরাসীতে কথা বলেন, ফরাসীতে উত্তর শুনতে ভালোবাসেন। আমরা যাঁরা তাঁর আমীর ওমরাহ আমরাও ফরাসী কেতায় দুরস্ত। বছরে দু'বছরে এক বার করে এ দেশে আসি এদের চাল চলনের সঙ্গে তাল মেলাতে। আমার বড় মেয়ে 'রাজ' এই দেশেই মানুষ হয়েছে। ছোট মেয়ে 'সুরজ' এখন থেকে এ দেশে পড়বে। বড় মেয়ে আমাদের সঙ্গে ফিরে যাবে। কিন্তু একমাত্র পুত্র মাহীন্দরকে নিয়ে মুশকিলে পড়েছি। সে চায় অক্‌স্‌ফোর্ডে বা কেম্‌ব্রিজে যেতে। কিন্তু মহারাজের অভিপ্রায় তা নয়।"

ভদ্রলোক চাপা গলায় বললেন, "ইংরেজ আমাদের পায়ের তলায় রেখেছে, সে কথা কি আমরা এক দিনের জন্যেও ভুলতে পেরেছি! শিক্ষার জন্যে আর যেখানেই যাই, ইংলডে নয়। ফরাসীতে কথা বলে মহারাজা ইংরেজকে অপ্রতিভ করতে ভালোবাসেন। ওরা তাঁকে ইংরেজীতে কথা বলাতে পারেনি। আমরা অবশ্য ইংরেজীও জানি ও বলি। সেটা তাঁর পছন্দ নয়।"

তন্ময় শোনবার ভাণ করছিল। কিন্তু শুনছিল না। তার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল তার পার্শ্ববর্তিনীর প্রতি। পার্শ্ববর্তিনী বলেছি, বলা উচিত দক্ষিণ পার্শ্ববর্তিনী। কেননা বাম পাশে বসেছিলেন সরদার রানী। উঁহুঁ। বলা উচিত সে বসেছিল সরদার রানীর ডান পাশে। আর তার ডান পাশে 'রাজ'।

কী চোখে যে দেখল তাকে তন্ময় তার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই মনের ভিতর থেকে ধ্বনি উঠতে লাগল, যাকে এত দিন খুঁজছিলে, রাজপুত্র, এই সেই রাজকন্যা রূপমতী। সে ধ্বনি এতই স্পষ্ট যে

হঠাৎ মনে হয় কাছে কোথাও সোনার শুক আছে, তারই কণ্ঠস্বর।

এই আমার রূপমতী। এই আমার অদৃষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হলো তন্ময়ের। আনন্দ করবে কী! বিষাদে ভরে গেল অন্তর। মনে পড়ল জীবনমোহনের আর একটি উক্তি, সুখের অন্বেষণ তোমার জন্যে নয়। তোমার জন্যে রূপের অন্বেষণ। তুমি তার জন্যে। সুখ যে কোনো দিন আসবে না তা নয়। আপনি আসবে, আপনি যাবে, তার আসা যাওয়ার দ্বার খোলা রেখো।

এই আমার অদৃষ্ট। অদৃষ্টের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থ' হয়ে গেল তন্ময়। একে পাব কি না জানিনে, পেলে ক'দিন ধরে রাখতে পারব, যদি আপনা থেকে ধরা না দেয়! অথচ এরই অনুসরণ করতে হবে চিরদিন ছায়ার মতো। এখন থেকে অনুসরণই অন্বেষণ। অন্বেষণের অন্য কোনো অর্থ নেই।.

'রাজ' ফরাসী ভাষায় কী বলল তন্ময় বুঝতে পারল না। তখন ইংরেজীতে বলল, "শুনতে পাই বাঙালীরা নাকি ভারতবর্ষের ফরাসী। সত্যি?"

"সেটা আপনাদের সৌজন্য।" তন্ময় বলল কৃতার্থ হয়ে। "তবে পাঞ্জাবীদের কাছে কেউ লাগে না। তারা ভারতের খড়্গবাহু।"

সরদার সাহেব তা শুনে হো হো করে হাসলেন। "তা হলে ভারত পরাধীন কেন?"

সরদার রানী মন্তব্য করলেন, "বাংলার সঙ্গে পাঞ্জাবের যোগাযোগ ছিল না বলে।"

"তা হলে", সরদার বললেন, "আজ থেকে যোগাযোগ স্থাপন করা হোক।" এই বলে বাংলাদেশের 'স্বাস্থ্য' পান করলেন।

এর উত্তরে পাঞ্জাবের 'স্বাস্থ্য' পান করতে হলো তন্ময়কে।

এমনি করে তাদের চেনাশোনা হলো। তন্ময়ের আর তার রূপমতীর। কথাবার্তার স্রোত কত রকম খাত ধরে বইল। কখনো

টেনিস, কখনো ঘোড়দৌড়, কখনো ভাগ্যপরীক্ষা ও জুয়োখেলা যার জন্যে রিভিয়েরা বিখ্যাত। কখনো শিকার, কখনো মাছ ধরা, কখনো বাচ খেলা যার জন্যে অক্স্ফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিখ্যাত। কখনো দোকান বাজার, কখনো পোশাক পরিচ্ছদ, কখনো আমোদপ্রমোদ যার জন্যে প্যারিস বিখ্যাত।

বিকেলে ওরা একসঙ্গে বেড়াতে গেল। দু'জনে মিলে নয়, সবাই মিলে। তন্ময় বেশির ভাগ সময় মাহীন্দরের কাছাকাছি। রাজকে আর একটু ভালো করে দেখবার জন্যে দূরত্ব দরকার। যতই দেখছিল ততই বুঝতে পারছিল এ সৌন্দর্য হীরা জহরতের নয়, নয় নীল বসনের, নয় আঁকা ভুরুর, নয় রাঙানো গালের। মিলো দ্বীপের এ ভীনাস মানুষের হাতে গড়া নয়, প্রকৃতির কৃতি। কোনোখানে এতটুকু অনাবশ্যক মেদ নেই, অনাবশ্যক রেখা নেই, অনুপাতের ভুল নেই, সুষমতার খুঁৎ নেই। দীঘল গড়ন। দুধ বরণ। মিশ কালো চুল বাবরির মতো ছাঁটা। কাঁটা বা ক্লিপ বা ফিতে লাগে না। মিশ কালো চোখ ঘন পক্ষ্মে ঢাকা। তাকায় যখন আসমানে তারা ফোটে। আর চলে যখন মাটিতে ঝরণা বয়ে যায়।

রূপসী? হাঁ, অনুপম রূপসী। লাবণ্যবতী? হাঁ, অমিত লাবণ্যবতী। এই আমার রূপমতী। আমার উত্তমা নায়িকা। আমার অদৃষ্ট। এরই অনুসরণ করতে হবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। বিয়ের আগে তো বটেই, বিয়ের পরেও বটে। যদি বিয়ে হয়। হবে কি? কে জানে! তন্ময় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। সব চেয়ে ভাবনার কথা রূপমতীর যদি আর কারো সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়। যদি না হয় বাজ বাহাদুরের সঙ্গে। অশ্রুবাষ্পে অস্পষ্ট দেখতে পায় তন্ময়, তার কোলে তার রূপমতী আর তার ঘোড়ার পিঠে সে বাজ বাহাদুর। ঘোড়া ছুটছে বিজলীর মতো, বজ্রের মতো গর্জে উঠছে সরদার সাহেবের বন্দুক। পিছনে ধাওয়া

করছে শিখ ঘোড়সওয়ার দল।

বর্ষশেষের রাত্রে ফ্যান্সী ড্রেস বল্ হলো হোটেলের বল্ রুমে। তন্ময় সেজেছিল বাজ বাহাদুর। কেউ জানত না কেন। আর রাজ সেজেছিল রাজপুতানী। সেটা তন্ময়ের ইঙ্গিতে। গ্র্যান্ড মোগল সেজে সরদার সাহেবের মেজাজ খুশ ছিল। আর সরদার রানীর হাসি ধরছিল না মমতাজ মহল সেজে। সে রাত্রের উৎসবে কে যে কার সঙ্গে নাচবে তার ঠিক ঠিকানা ছিল না, বাছ বিচার ছিল না। তন্ময় আর্জি পেশ করল, রাজ মঞ্জুর করল। বাপ মা কিছু মনে করলেন না। নাচে তন্ময়ের কিছু স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতা ছিল। রাজ পছন্দ করল তাকেই বার বার। রাত বারোটা বাজল, নতুন বছর এলো, উল্লাস মুখরিত কক্ষে কেউ লক্ষ্য করল না এদের দু'জনের ঘোড়া ছুটেছে কোন অজ্ঞাত রাজ্যে, কোন দুর্গম দুর্গে, কোন নিভৃত কুঞ্জে। তন্ময় কানে কানে বলল, "এই গল্পের শেষে কী? বিচ্ছেদ না মিলন?" রাজ কানে কানে বলল, "যেটা তোমার খুশি।" তন্ময়ের বুক দুলে উঠল। সে কাঁপতে কাঁপতে কোনো মতে বলতে পারল, "জগতের সবচেয়ে সুখী পুরুষ আমি।" কিন্তু বলেই তার মনে হলো, "তাই কি? এত রূপ নিয়ে কেউ কখনো সুখী হতে পারে?"

সরদার সাহেবরা এর পরে জেনেভায় চললেন। তন্ময় ফিরে গেল অক্স্ফোর্ডে। কিন্তু সেখানে তার একটুও মন লাগল না। খেলতে গিয়ে বার বার হারে, পড়তে গিয়ে আন্মনা থাকে। কেউ ডাকলে যায় না, গেলে চুপ করে থাকে। ওদিকে চিঠি লেখালেখি শুরু হয়েছিল। ওরা জেনেভা থেকে প্যারিস হয়ে দেশে ফিরছে শুনে তন্ময় বুঝতে পারল এই তার শেষ সুযোগ। এখন যদি বিয়ের প্রস্তাব করে তা হলে হয়তো একটুখানি আশার আমেজ আছে। দেশের মাটিতে যেটা দিবাস্বপ্ন প্যারিসের আবহাওয়াতে সেটা সত্য হয়ে যেতেও পারে।

সুরজকে প্যারিসে রেখে মাহীন্দরকে জেনেভায় দিয়ে রাজকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে ফিরে যাচ্ছেন তাদের মা বাবা। তন্ময় গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করল। তাঁরা বললেন, "তুমি ছেলেমানুষ। তুমি আমাদের ছেলে। তাই ছেলের মতো আবদার করছ। কিন্তু, বাবা, এমন আবদার করতে নেই। তোমার জানা উচিত যে আমাদের সমাজে এটা অচল। আর আমরা তো সত্যি ফরাসী নই, আমরা শিখ। তোমাকে আমরা কলকাতায় খুব ভালো ঘরে বিয়ে দেব। সেও খুব সুন্দরী হবে।"

"আমি যদি আপনাদের ছেলে হয়ে থাকি," তন্ময় বলল বুদ্ধি খাটিয়ে, "তা হলে আমাকে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন আপনাদের রাজ্যে। সেখানে একটা কাজকর্ম জুটিয়ে দেবেন। আপনাদের কাছাকাছি থাকব।"

"সে কী!" সরদার সাহেব অবাক হলেন, "তুমি অক্‌স্‌ফোর্ডের পড়া শেষ না করেই সংসারে ঢুকবে! কোনো বাপ কোনো ছেলেকে এমন পাগলামি করতে দেয়!"

সরদার রানী বললেন, "তোমার বাবা আমাদের ক্ষমা করবেন না, বাচ্চা।"

তন্ময় কিন্তু সত্যি সত্যিই তল্পি তল্পা গুটিয়ে তাঁদের সঙ্গে জাহাজে উঠে বসল। তার মন বলছিল এই তার শেষ সুযোগ, সুযোগভ্রষ্ট হয়ে অক্‌স্‌ফোর্ডে সময়পাত করা মূর্খতা। একটা পণ্ডিতমূর্খ হয়ে সে করবে কী! সবাই যা করে তাই? চাকরি, বিয়ে, বংশবৃদ্ধি? সেটা তো রূপমতীর অন্বেষণ নয়, সেটা রৌপ্যবতীর অন্বেষণ।

রাজ সুখী হয়েছিল তন্ময়ের নিষ্ঠায়। কিন্তু তার মা বাবার মুখ অন্ধকার। এ আপদ কবে বিদায় হবে কে জানে! এ যদি মেয়ের মন পায় তা হলে সে কি আর কাউকে বিয়ে করতে রাজী হবে?

তন্ময় কল্পনা করেনি তাঁদের আরেক মূর্তি দেখবে। কথা বলবেন কি, লক্ষ্যই করেন না তাকে। আমলেই আনেন না তার অস্তিত্ব। সে যদি গায়ে পড়ে ভদ্রতা করতে যায় এমন সুরে ধন্যবাদ জানান যে মুর্দাবাদ বললে ওর চেয়ে মিষ্টি শোনায়। বেচারা তন্ময়!

আত্মসম্মান যার আছে সে করাচীতেই সরে পড়ত, কিংবা বড় জোর লাহোর পর্যন্ত গিয়ে কেটে পড়ত। কিন্তু তন্ময়ের গায়ের চামড়া মোটা। সে মান অপমান গায়ে মাখল না। সরদার সাহেব তাকে নিয়ে করেন কী! অক্‌স্‌ফোর্ডফের্তা ভদ্রলোকের ছেলেকে তো সকলের সামনে ধমকাতে পারেন না। শুধু তাই নয়, সে নামকরা খেলোয়াড়। খেলোয়াড়কে তিনি সমীহ করেন। ছেলেটি তা দেখতে শুনতে খারাপ নয়, গুণীও বটে। জাতে বাধে, নইলে মন্দ মানাত না মেয়ের সঙ্গে। গৃহিণীও সেই কথা.বলেন।

চলল তন্ময় শিখ রাজ্যে। অতিথি হয়ে। তারপর মহারাজার খেলোয়াড় দলে টেনিসের 'কোচ' নিযুক্ত হয়ে সে হোটেলে জাঁকিয়ে বসল। তার খরচের হাত দরাজ। যা পায় ফুঁকে দেয় আদর আপ্যায়নে। খোশ গল্পে তার জুড়ি নেই। স্বয়ং মহারাজা তাকে ডেকে পাঠান তার 'কিস্‌সা' শুনতে। বাঙালীকে সেখানে বোমারু বলেই জানে পাঁচজনে। খাতিরটা ওর দৌলতেও জুটল। তবে পুলিশের খাতায় নাম উঠল।

ওদিকে যে জন্যে তার এতদূর আসা সে জন্যেও তার চেষ্টার অবধি ছিল না। রাজ আর কাউকে বিয়ে করবে না বলে তাকে বাক্য দিল। কিন্তু মা বাপের অমতে তাকেও বিয়ে করবে না বলে মাফ চাইল। তন্ময় দেখল এটা মন্দের ভালো। মেয়ে চিরকুমারী থাকে কোন বাপ মা'র প্রাণে সয়! এঁরাও মত না দিয়ে পারবেন না।

হলোও তাই। মহারাজার নির্বন্ধে বিয়ের অনুমতি পাওয়া গেল, কিন্তু ভারতে নয়। আবার যেতে হলো ফ্রান্সে। সেখানে বিয়ে হয়ে

গেল ধুমধাম না করে। হানিমুনের জন্যে আবার গেল নীসের কাছে সেই না-শহর না-গ্রামে। আবার সেই হোটেল, সেই সমুদ্রতীর, সেই পাইন বন, জলপাই বন।

তন্ময়ের মতো সুখী কে? জগতের সুখীতম পুরুষ তার প্রিয়ার দিকে তাকায় আর মনে মনে জপ করে, এ কি থাকবে? এ কি যাবে? এ সুখ কি দুদিনের? এ কি সব দিনের? আসা যাওয়ার দ্বার খুলে রাখতে বলেছেন জীবনমোহন। খোলা রাখলে কি সুখ থাকে? আর রূপ? সেও কি শাশ্বত?

রাজ যদি এত সুন্দর না হতো তা হলে হয়তো তন্ময় চিরদিন সুখী হবার ভরসা রাখত। কিন্তু সে যে বড় বেশি সুন্দর। সৌন্দর্যের ডানা আছে, সেইজন্যে সেকালের লোক সুন্দরী আঁকতে চাইলে পরী আঁকত। পরীর অঙ্গে ডানা জুড়ে বোঝাতে চাইত, এ থাকবে না। উড়ে যাবে। একে ধরে রাখতে গেলে যা বা থাকত তাও থাকবে না।

রাজের অঙ্গে ডানা নেই, কিন্তু ডানার বদলে আছে মানা। তার গায়ে হাত দিতে সাহস হয় না। স্পষ্ট কোনো নিষেধ আছে তা নয়। মুখ ফুটে কোনো দিন সে 'না' বলেনি।, তবু তন্ময় জানে যে খেলার যা নিয়ম। এ খেলার নিয়ম হচ্ছে, দেখতে মানা নেই, ছুঁতে মানা। মিলো দ্বীপের ভীনাসের গায়ে কেউ হাত দিক দেখি? হৈ হৈ করে তেড়ে আসবে গোটা লুভ্‌র মিউজিয়াম। অথচ দেখতে পারো যতক্ষণ ইচ্ছা, যতবার ইচ্ছা। সুন্দরী নারীর স্বামীও একজন দর্শক মাত্র।

মধুমাসের পরে ওরা ইংলণ্ডে গেল। সেখানে তন্ময়ের জনকয়েক লাট বেলাট মুরুব্বি ছিলেন। তার খেলার সমজদার। তাঁদের সুপারিশে তার একটা চাকরি জুটে গেল ইণ্ডিয়ান আর্মির পুনা দপ্তরে। পুনায় ঘর বাঁধল তারা দুটিতে মিলে। অত বড় সৌভাগ্য দু'জনের একজনও প্রত্যাশা করেনি। রাজ খুশি হয়েছে দেখে

তন্ময়ের খুশি দ্বিগুণ হলো। আফিসের মালিক আর ঘরের মালিক, দুই মালিকের মন জোগাতে গিয়ে মেহনতও হলো দ্বিগুণ।

বছর দুই তাদের শিস দিতে দিতে ছুটে চলল বম্বে মেলের মতো। তার পরে আর মেল ট্রেন নয়, প্যাসেঞ্জার ট্রেন। পুনায় তন্ময়ের কাজ, কিন্তু রাজ থাকে বেশির ভাগ সময় বম্বেতে। সেখানে তাকে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় ঘোড়দৌড়ের মাঠে আর উইলিংডন ক্লাবে। তার বন্ধু বান্ধবীরা মিলে শখের নাটক করলে তাকে ধরে নিয়ে যায় অভিনয় করতে। অভিনয়ে তার সহজাত প্রতিভা ছিল। হিন্দ ফিল্ম স্টুডিও থেকে তার আহ্বান এলো। সে তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি যদি বারণ কর আমি যাব না।" তন্ময় বলল, "আমি যদি বারণ না করি?" রাজ চোখ নামিয়ে বলল, "থাক।"

তন্ময় বুঝতে পেরেছিল তার উত্তমা নায়িকা স্বাধীনা নায়িকা। ভালো বাসা না বাসা তার মর্জি। বিবাহ করেছে বলে কর্তব্যবোধ জন্মেছে, কর্তব্যের দাবী মানতে সে রাজী। কিন্তু তাতে তার মর্জির এদিক ওদিক হয়নি। সে দিক থেকে সে অবিবাহিতা, অবন্ধনা। কর্তব্য যদি মর্জিকে গ্রাস করতে যায় বিবাহের বেড়া ভাঙতে কতক্ষণ! তন্ময় শিউরে উঠল।

সাবরমতী গিয়ে অনুত্তম দেখল আশ্রম তো নয় শিবির। সন্ন্যাসী তো নন সেনানায়ক। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঊনপঞ্চাশ বায়ুর মতো ছুটে আসছে ছোট বড় সৈনিক। একই জ্বালা তাদের সকলের অন্তরে। পরাধীনতার জ্বালা, পরাজয়ের জ্বালা।

আবার কবে লড়াই শুরু হবে? কে জানে!

কত কাল আমরা অপেক্ষা করব? কে জানে!

তত দিন আমরা কী করব? গঠনের কাজ।

গঠনের কাজ কেন করব? না করলে পরের বারের সংঘর্ষে হার হবে।

পার্লামেণ্টারি কাজ কেন নয়? তাতে জনগণের সঙ্গে সংযোগ ক্ষীণ হয়ে আসে।

অনুত্তমের মনে সন্দেহ ছিল না যে গান্ধীজীর নির্দেশ অভ্রান্ত। কিন্তু তার সহকর্মীদের অনেকে পরিবর্তনের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল। গঠনকর্মে তাদের মন নেই। তারা চায় পার্লামেণ্টারি কর্মক্রম। নয়তো চিরাচরিত অস্ত্র। বন্দুক তলোয়ার বোমা রিভলভার। হিংসা।

জাতির জীবনে জোয়ার আছে, ভাঁটা আছে। জোয়ার আজ নেই বটে, কিন্তু কাল আবার আসবে। এ বিশ্বাস যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে তবে গোড়ায় গলদ। সে গলদ সারবে না নির্দেশ পরিবর্তনে। সারবে, যদি বিশ্বাস ফিরে আসে। তখন জোয়ারের জন্যে ধৈর্য ধরতে হবে। ধৈর্যের সঙ্গে পালন করতে হবে সেনানায়কের নির্দেশ। অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। না করলে পরের বারও পরাজয়।

তিন দিন অনুত্তম গান্ধীজীর সঙ্গে ছিল। লক্ষ্য করল তিনি

যেমন জ্বলছেন আর কেউ তেমন নয়। আর সকলের জ্বালা বাইরে বিকীর্ণ হয়ে জুড়িয়ে যাচ্ছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে। তাঁর জ্বালা বাইরে আসতে পায় না, জ্বলতে জ্বলতে বাইরেটাকে খাক করে দেয়। বাইরের রূপ ভস্ম হয়ে গেছে, তাই তাঁকে সন্ন্যাসীর মতো দেখতে। আসলে তিনি সন্ন্যাসী নন, বীর। সীতা উদ্ধার করবেন বলে কৃত-সংকল্প। তাই রামের মতো বল্কল পরিহিত কৌপীনবন্ত ফলাহারী জিতেন্দ্রিয়।

সাবরমতী থেকে অনুত্তম নতুন কোনো নির্দেশ নিয়ে ফিরল না, কিন্তু তার অন্তর্জ্বালা আরো তীব্র হলো। গান্ধীজী যেন তাকে আরো উজ্জ্বল করে জ্বালিয়ে দিলেন। অথচ জ্বলে ওঠা আগুন যাতে জুড়িয়ে না যায়, ফুরিয়ে না যায়, ধোঁয়ায় ঢেকে না যায়, সে সঙ্কেত শেখালেন। তাঁর পরামর্শে অনুত্তম পূর্ব বঙ্গে শিবির স্থাপন করল।

ও দিকে জীবনমোহনের কাছে সে যা শিখেছিল তাও ভুলে গেল না। ধ্যান করতে লাগল সেই বিদ্যুৎপ্রভার যাকে দেখতে পাওয়া যায় শুধু দুর্যোগের রাত্রে। অন্য সময় তার অন্বেষণ করে কী হবে! পদ্মাবতীর অন্বেষণ দিনের পর দিন নয়। তার জন্যে প্রতীক্ষা করতে হয় ঝড় বাদলের। যে পটভূমিকায় বিদ্যুদ্‌বিকাশ হয়।

এই যে শিবির স্থাপন, এই যে গঠনের কাজ, এও তো সেই বিদ্যুৎপ্রভার জন্যে, তার স্ফুরণের উপযোগী পটভূমিকার জন্যে। এমনি করেই তো সে জনগণকে জাগাচ্ছে, আইন অমান্যের জন্যে তৈরি করছে, শাসকদের রাগাচ্ছে, ঝড়বাদলকে ডেকে আনছে। ঝড় যদি আসে বিজলী কি আসবে না?

অনুত্তম বিশ্বাস করে যে তার সাধন ব্যর্থ হবে না। ঝড়ও ডাকবে, বিজলীও চমকাবে। সে প্রাণ ভরে দেখবে সেই দৃশ্য। তার দেখেই আনন্দ। আর কোনো আনন্দে কাজ নেই। বিদ্যুতের সঙ্গে

ঘর করা কি সত্যি সত্যি সে চায় নাকি! বিদ্যুতের বিদ্যুৎপনা যদি মিলিয়ে যায় তা হলে তার সঙ্গে বাস করায় কী সুখ? আর যদি নিত্যকার হয় তা হলেও সুখ বলতে যা বোঝায় তা কি সম্ভবপর? সুখের স্বপ্ন অনুত্তমের জন্যে নয়। দাম্পত্য সুখের স্বপ্ন। তা বলে আনন্দ থাকবে না কেন জীবনে? থাকবে সাক্ষাতে পরিচয়ে সহযোগিতায়। থাকবে অশরীরী প্রেমে।

ত্যাগী কর্মী বলে অনুত্তমের যশ ছড়িয়ে পড়ল। সন্ন্যাসী বলে শ্রদ্ধা করল কত শত লোক। কিন্তু অন্তর্যামী জানলেন যে সে সাধু নয়, বীর। ত্যাগী নয়, প্রেমিক। কর্মী নয়, সৈনিক। তার জীবন-দর্শনে নারীর স্থান আছে। সে নারী সামান্য মানবী নয়, চিরন্তনী নারী, সে কোথায় আছে কে জানে! কিন্তু আছে কোথাও! না থাকলে সব মিথ্যা। এই কর্মপ্রয়াস, এই বিষয়বিরাগ, এই পল্লী অঞ্চলে স্বেচ্ছানির্বাসন।

অনুত্তম সারা দিন খাটে আর সব আশ্রমিকের মতো। সন্ধ্যার পর যখন ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসে, কেরোসিনের দাম জোটে না, তখন একে একে সকলের সুনিদ্রা হয়। তার হয় অনিদ্রা। রাত কেটে যায় আকাশের দিকে চেয়ে। প্রসন্ন আকাশ। শান্ত আকাশ। তারায় তারায় ধবল। এই এক দিন কাজল হবে মেঘে মেঘে। মেঘের কালো কষ্টিপাথরে সোনার আঁচড় লাগবে। বিজলীর সোনার। তখন চোখ ঝলসে যাবে, চাইতে পারবে না। তবু প্রাণ ভরে উঠবে অব্যক্ত আবেগে। বন্দে প্রিয়াং।

হায়! ১৯২৫ সালের আকাশে মেঘ কোথায়! কিংবা ১৯২৬ সালের আকাশে! অনুত্তমের মনে হলো ১৯২৭ সালের আকাশে মেঘ করে আসছে, কিন্তু সে কেবল বাক্যের ঘনঘটা। তার চরম দেখা গেল ১৯২৮এর আকাশে। কলকাতা কংগ্রেসে তুমুল উত্তেজনার মধ্যে এক বছরের চরমপত্র দেওয়া হলো। এই এক বছর অনুত্তম

অনুত্তম আকাশের দিকে চাতকের মতো তাকিয়ে কাটালো। হাঁ, মেঘ দেখা যাচ্ছে বটে। এবার হয়তো বিদ্যুৎ দেখা দেবে।

বছর যেন আর ফুরোয় না। চলল অনেক দিন ধরে শাসকদের মুখ চাওয়া, কী তাঁরা দেন না দেন। ইংলণ্ডে লেবার পার্টির জয় হলো। আশাবাদীরা আশা করলেন এইবার ভারতের কপালে শিকে ছিঁড়বে। কিন্তু যা হবার নয় তা হলো না। অনুত্তম হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে তো বিনা দ্বন্দ্বে স্বাধীনতা চায় না। চায় দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে। শুনতে চায় বজ্রের গর্জন, দেখতে চায় বিদ্যুতের ফণা। ইংলণ্ড যদি দয়া করে কিছু দেয় তা হলে তো সব মাটি। এত দিনের প্রতীক্ষা নিষ্ফল।

সেইজন্যে ৩১শে ডিসেম্বর রাত যখন পোহালো অনুত্তমের মুখ ভরে গেল হাসিতে। বিদায় ১৯২৯ সাল। বিদায় শান্তি স্বস্তি আরাম। স্বাগত ১৯৩০। স্বাগত দ্বন্দ্ব দুঃখ পদ্মিনীর দর্শন। আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে। বজ্রের আর কত দেরি? বিদ্যুতের?

মার্চ মাসে গান্ধীজী দণ্ডী যাত্রা করলেন। লবণ সত্যাগ্রহ মানসে। অনুত্তম চুপ করে বসে থাকবার পাত্র নয়। আশ্রমিকদের তাড়া দিয়ে বলল, এত দিন আমরা জনগণের নুন খেয়েছি, নিমকের ঋণ শোধ করি চলো।

চলল তারা সদলবলে লবণ সত্যাগ্রহ করতে। কাছে কোথাও সমুদ্র ছিল না। যেতে হলো চট্টগ্রাম। অনেক দূরের পথ। পায়ে হেঁটে যেতে মাস খানেক লাগে। পথের শেষে পৌঁছবার আগে খবর এলো চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুট হয়েছে। বিদ্রোহীদের সঙ্গে সরকারের সংগ্রাম চলছে। রোমাঞ্চকর বিবরণ। কেউ বলে, চট্টগ্রামের ইংরেজরা জাহাজে করে পালিয়ে গেছে। কেউ বলে, পালাবার পথ বন্ধ। বিদ্রোহীরা রেল স্টীমার টেলিগ্রাফ দখল করে ফেলেছে। ইংরেজরা এখন জেলে। কেউ বলে, একে একে কুমিল্লা নোয়াখালি সব

বিদ্রোহীদের হাতে চলে যাবে। দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ!

অনুত্তম বিস্ময়ে হতবাক হলো। দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ? সিপাহীরা যোগ দেবে তা হলে? কই, এমন তো কথা ছিল না? গণ সত্যাগ্রহ কি তা হলে সিপাহী বিদ্রোহের অর্গল খুলে দিতে! কেন তবে অহিংসার উপর এত জোর দেওয়া? অনুত্তম ঘন ঘন রোমাঞ্চ বোধ করল। কী হবে লবণ আইন ভঙ্গ করে! সিপাহীদের বলো বিদ্রোহী হতে। ভারতময় যদি সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে, এক প্রান্তের ঢেউ চার প্রান্তে পেঁছিয় তা হলে তো দেশ স্বাধীন।

কিন্তু আশ্রমিকদের মধ্যে ভয় ঢুকল। চট্টগ্রামের দিকে কেউ এগোতে চায় না। গ্রামের লোক ভয়ে আশ্রয় দেয় না। ভিক্ষা দেয় না। পুলিশ আসছে শুনে তারা তটস্থ। অনুত্তম আশ্চর্য হলো তাদের মনোভাব দেখে। কেউ তারা বিশ্বাস করবে না যে বিদ্রোহীরা জিতবে, সরকার হারবে। ইংরেজ রাজত্ব কোনো দিন অস্ত যাবে এ তারা ভাবতেই পারে না। দাদাবাবুরা যাই বলুন মহারানীর নাতি কখনো গদি ছাড়বে না, কারো সাধ্য নেই যে তাকে গদি থেকে হটায়।

আশ্রমিকরা একে একে আশ্রমে ফিরে গেল। সেখান থেকে আর কিছু করে জেলে যাবে। জেলে যাওয়াটাই যেন লক্ষ্য। কিন্তু অনুত্তমের মনে কাঁটা ফুটল। না, তা তো লক্ষ্য নয়। দেশ জয় করাটাই লক্ষ্য। আমাদের দেশ আমরা জিনে নেব। চট্টগ্রামের বিদ্রোহীরা দেখিয়ে দিয়েছে কেমন করে তা সম্ভব।

ভিতরে ভিতরে সে অধীর হয়ে উঠেছিল তার পদ্মাবতীর জন্যে। গণ সত্যাগ্রহ চলেছে চলুক। সঙ্গে সঙ্গে চলুক সশস্ত্র বিদ্রোহ। এমনি করে গগন সঘন হবে। হাওয়া উঠবে। তুফান আসবে। বাজ পড়বে। বিজলী ঝলকাবে। ভয় কিসের! এই তো সুযোগ। শুভদৃষ্টি এমনি করেই ঘটবে। ঘটনা! ঘটনা! ঘটনার পর ঘটনা! ঘটনাই তার কাম্য।

অনন্তম একা চট্টগ্রামের দিকে পা বাড়াল। কী ঘটছে সে নিজের চোখে দেখবে। সম্ভব হলে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করবে।

কিন্তু তাকে বেশি দূরে যেতে হলো না। খবর এলো বিদ্রোহীরা হেরে গেছে। রেল স্টীমার টেলিগ্রাফ সরকারের হাতে ফিরে গেছে। ইংরেজরা এখন বেড়াজাল দিয়ে বন্দী করছে যাকে পাচ্ছে তাকে। গ্রামকে গ্রাম তাঁবু দিয়ে ছাওয়া। সেখানে ইংরেজ সৈন্য, ইংরেজের পুলিশ। হা ভগবান! তারা আমাদেরই দেশের লোক।

অনন্তম শুনল ইংরেজ দারুণ অত্যাচার করছে। করবেই তো। এবার তার হাতে চাবুক। তার দয়াধর্মের কাছে মায়াকান্না কেঁদে কী হবে! যারা দেশ জয় করে নেবার স্পর্ধা রাখে তারা অত সহজে কাকুতি মিনতি করে কেন? যারা যুদ্ধে নেমেছে তারা কি সব জেনেশুনে নামেনি? তা হলে কি বলতে হবে ঐ কয়টি মাথাপাগলা যুবক ভুল করছে?

চট্টগ্রামে পৌঁছে অনন্তম দেখল সকলে প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে তারা এর মধ্যে নেই, তারা জানতই না যে এ রকম কিছু ঘটবে বা ঘটতে পারে, তারাও বিস্ময়ে থ হয়ে গেছে। ইংরেজ সে কথা শুনবে কেন? তার বিশ্বাস ভেঙে চুরমার। হিন্দুকে সে আর বিশ্বাস করে না। মুসলমানই তার একমাত্র আশা ভরসা। ঐ বিদ্রোহের নিট ফল হলো হিন্দু মুসলমানে মন কষাকষি। কারণ এক জনের যাতে শাস্তি আরেক জনের তাতে পুরস্কার।

কী যে করবে অনন্তম কিছুই বুঝতে পারল না। ব্যথায় তার বুক টন টন করছে, রক্ত ঝরছে কলিজা থেকে। ইচ্ছা করলেই কারাগারে গিয়ে শাস্তি পাওয়া যায়। কিন্তু সেটা হবে বিপদ থেকে পলায়ন। না, সে পালাবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবে। চট্টগ্রামেই সে তার দাঁড়াবার জায়গা করে নিল। সন্ত্রস্তদের বলল,

ভয় কী? আমি আছি।

রইল তার গণ সত্যাগ্রহ, রইল তার পদ্মাবতীর অন্বেষণ। একেবারে ভুলে গেল যে পদ্মাবতী বলে কেউ আছে ও তার দেখা পাওয়া যায় এমনি দুর্যোগে। তার বেলা দুর্যোগই সুযোগ।

সন্ধ্যার পরে বাইরে যাওয়া বারণ। "কারফিউ" চলছে। অনুত্তম পারমিট চাইতে পারত, কিন্তু তাতে অপমানের মাত্রা বাড়ত। চুপ-চাপ বাড়ী বসে থাকতেও ভালো লাগে না, মনে হয় কী যেন একটা কর্তব্য ছিল বাইরে। অভ্যাসমতো তকলি নিয়ে বসে, সুতো কাটে। কিন্তু তাতেও আগের মতো আস্থা নেই। হায়! সে যদি গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে মরতে পারত।

এই যখন তার মনের অবস্থা তখন তাকে ডাক দিল তার বন্ধু সরিৎ। সেও চট্টগ্রামে এসেছে আর একটা দল থেকে। সে পুলিশের মার্কামারা লোক, কাজেই গা ঢাকা দিয়েছে। কে জানে কী তার কাজ! অনুত্তম তার সঙ্গে দেখা করতেই সে বলল, "তোর সাহায্য না পেলে চলছে না। খুশি মনে রাজী না হলে কিন্তু চাইনে। ভয়ানক ঝুঁকি। পদে পদে বিপদ।"

অনুত্তম তো মরতে পারলে বাঁচে। মরার চেয়ে কী এমন ঝুঁকি থাকতে পারে!

"হাঁ, তার চেয়েও ভয়ানক ঝুঁকি আছে। ধরা পড়লে ওরা এমন যাতনা দেবে যে পেটের কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে। তা হলে ধরা পড়বে আর সকলে। ধরা পড়লে তুই সায়ানাইড খেতে রাজী আছিস?"

অনুত্তম ক্ষণকাল অবাক হয়ে ভাবল। বলল, "রাজী।"

"কী জানি, বাবা! তোরা অহিংসাবাদী। শেষ কালে বলে বসবি তোর বিবেকে বাধছে।"

অনুত্তম তাকে আশ্বাস দিল। ধরা পড়লে বেঁচে থাকতে তার

রুচি ছিল না।

"তা হলে আজকেই তুই তৈরি হয়ে নে। কারফিউ অমান্য করেই তোকে আজ রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে সংকেতস্থানে। আমি তোর সঙ্গে একজনকে দেব। তাকে কলকাতায় পেঁছে দিয়ে তোর ছুটি। কী করে পেঁছে দিবি সেটা তোর মাথাব্যথা। আমার নয়। মনে রাখিস্, ধরা পড়ার ঝুঁকি প্রতি পদে। গোয়েন্দায় ছেয়ে গেছে এ জেলা। আমি হলে মৌলবী সাহেব সাজতুম।"

অনুত্তম তার গুরু দায়িত্বের জন্যে অবিলম্বে প্রস্তুত হলো। সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নিল না। নিল পোটেসিয়াম সায়ানাইড। কয়েক বছর হলো সে দাড়ি কামানো ছেড়ে দিয়েছিল। তাই তাকে দেখাত মৌলবীর মতো। মুসলমানী পোশাক জোগাড় করে সে পুরোদস্তুর মৌলবী বনে গেল। চট্টগ্রামে প্রচলিত কেচ্ছা পুঁথি এক কালে তার পড়া ছিল। এক বস্তানি পুঁথি, একটা বদনা, একটা ব্যাগ ও তার সেই বিখ্যাত নীল চশমা তার সম্বল হলো। এই নিয়ে সে সন্ধ্যার পর অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল।

এতিমখানার কাছে একটি গাছের আড়ালে সরিৎ লুকিয়েছিল, তার সঙ্গে ছিল আরো একজন। অনুত্তম অন্ধকারেও নীল চশমা পরেছিল, তবু তার ঠাহর করতে এক লহমাও লাগল না যে ওই আর একজনটি মেয়ে। তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। মেয়ে! সন্ন্যাসী না হলেও তার সন্ন্যাসীসুলভ সংস্কার ছিল। তার সেই সংস্কার তাকে বলল, দেখছ কী! দৌড় দাও। দৌড়তে গিয়ে গুলি খেয়ে মরো, সেও ভালো। কিন্তু এ যে মেয়ে!

সরিৎ তার হাতে এক তাড়া নোট গুঁজে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। মেয়েটির নাম পর্যন্ত বলে গেল না। পরিচয় দেওয়া দূরের কথা। এমন অদ্ভুত অবস্থা কেউ কখনো কল্পনা করেছে? অনুত্তম তো করেনি। তার কাজ তা হলে এই মেয়েটিকে পুলিশের নজর বাঁচিয়ে

কলকাতা নিয়ে যাওয়া। কিন্তু ও দিকে যে হিন্দুর মেয়েকে অপহরণ করার অভিযোগে মৌলবী সাহেবের কোমরে দড়ি আর হাতে হাত-কড়া পড়বে। পা দুটো যে একটু একটু কাঁপছিল না তা নয়। কেন যে মরতে মৌলবী সেজে এলো!

অন্ধকারে অমন একটা জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। অত্যন্ত দুঃসাহসের সঙ্গে অনুত্তম বলল, "আমার নাম শা মুহম্মদ রুকনুদ্দিন হায়দার এছলামাবাদী। আপনার নাম যদি কেউ পুছ করে জওয়াব দেবেন মুসম্মৎ রওশন জাহান। কেমন? বোঝলেন?"

মেয়েটি বলল, "হাঁ।"

"হাঁ নয়। জী হাঁ।"

"জী হাঁ।"

এক অপরিচিতা নারী, বোরখায় তার সর্বাঙ্গ ঢাকা। ভিতর থেকে তার চোখ দুটি জ্বল জ্বল করছে আঁধার রাতে জোনাকির মতো। কে জানে তার বয়স কত! পনেরো না পঁচিশ না পঁয়ত্রিশ। তবে কথার সুর থেকে অনুমান হয় একুশ বাইশ হবে। এতদিন কি কেউ অবিবাহিতা থাকে? হয়তো বিধবা। সধবা যে নয় তাই বা কী করে বোঝা যাবে?

তবু চলতে চলতে অনুত্তম বলল, "কেউ পুছলে এ ভি বলবেন কি আমি আপনার খসম।"

"জী হাঁ।"

অনেক ঘুরে ফিরে মিলিটারি পেট্রোল এড়িয়ে ছিপে ছিপে ওরা চলল। চলল শহর ছাড়িয়ে, মাঠের আইল ধরে, গোরুর গাড়ীর হালট ধরে, গোপাট ধরে, গ্রামের লোককে না জাগিয়ে, চৌকিদারকে দূরে রেখে। অনুত্তম আগে আগে, রওশন তার পিছন পিছন।

রাত যখন পোহাল তখন ওরা চাটগাঁ ও সীতাকুণ্ডুর মাঝামাঝি একটা রেলস্টেশনের কাছাকাছি এসে পড়েছে। অনুত্তম অন্যমনস্ক

ছিল। রওশন বলল, "দেখবেন সামনে জল।"

"সামনে জল নয়। ছামনে পানী।"

"জী হাঁ। ছামনে পানী।"

মেয়েদের ওয়েটিং রুমে রওশনকে বসিয়ে অনুত্তম গেল টিকিটের খোঁজে। ট্রেনের তদারকে। কলকাতার টিকিট চাইলে পাছে সন্দেহ করে সেই জন্যে বলল, কুমিল্লার টিকিট। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সেদিকে যাবার ট্রেন পাওয়া গেল। তখন মেয়েদের কামরায় বিবিকে উঠিয়ে দিয়ে মৌলবী সাহেব উঠলেন যেখানে সব চেয়ে বেশি ভিড়। বলা বাহুল্য থার্ড ক্লাসে।

ফেনীতে কিছু হেনস্তা হতে হলো বিবিকে দেখতে গিয়ে। এক চোট অন্যান্য বিবিদের হাতে, এক চোট তাদের খসমদের হাতে, শেষে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে। তওবা তওবা করে নিজের জায়গায় ফিরে যেতে হলো। লাকসামে যখন গাড়ী দাঁড়াল অনুত্তম দেখল রওশনের কামরা খালি হয়ে যাচ্ছে। তার নিজের কামরাও। তখন সে চট করে বেরিয়ে গিয়ে ফরিদপুরের টিকিট কেটে নিয়ে এলো। রওশনকে বলল, "শোনছেন? এ গাড়ী চাঁদপুর যাবে না। গাড়ী বদল করতে হবে।" আবার তারা দু'জনে দুই কামরায় উঠে বসল।

চাঁদপুরের স্টীমারে কিন্তু মেয়েদের কাঠরায় ঠাঁই হলো না। ডেকের এক কোণে মাথা গুঁজতে হলো রওশনকে আরো কয়েকজন বিবির সঙ্গে। পর্দা ছিল না। কাছেই ছিল অনুত্তম প্রভৃতি পুরুষ। মাঝখানে কোনো বেড়া ছিল না। শুধু ছিল বোরখা। বোরখাও ক্ষণে ক্ষণে খুলে যাচ্ছিল খেতে ও খাওয়াতে। শিশু ছিল সঙ্গে। এমনি এক অসতর্ক মুহূর্তে চার চোখ এক হলো। অনুত্তমের। রওশনের।

সে চোখে পাঞ্চালীর তেজ, পাঞ্চালীর রোষ, পাঞ্চালীর লাঞ্ছনা। অপমানে নীল হয়ে গেছে তার মুখ। নইলে এমনিতে বেশ ফরসা।

এক রাশ কোঁকড়া কালো কেশ অবিন্যস্ত এলায়িত। যেন পাঞ্চালীর মতো প্রতিজ্ঞা করেছে দুঃশাসন বেঁচে থাকতে বেণী বাঁধবে না। ইস্পাতের ফলার মতো ছিপছিপে গড়ন। কাপড়ে আগুন লেগেছে। সে আগুন ধরে গেছে প্রতি অঙ্গে, ঢেউ খেলিয়ে যাচ্ছে অঙ্গচালনায়, সাপ খেলিয়ে যাচ্ছে অঙ্গভঙ্গীতে। অগ্নিশিখার মতো জ্বলছে তার সর্ব শরীর। জ্বলছে আর তাপ বিকীরণ করছে। তপ্ত হয়ে উঠছে আবহাওয়া।

এ কোন নতুন স্নেহলতা! কেন এমন করে আত্মহত্যা করছে। অনুত্তম ভুলে গেল যে সে নিজেও জ্বলছে, তার মতো জ্বলছে কত সোনার চাঁদ ছেলে, জ্বলবে না কেন সোনার প্রতিমা মেয়েরাও? বাংলাদেশের এই কুরুক্ষেত্রে পাঞ্চালীরাও থাকবে পান্ডবদের জ্বালা জোগাতে, ভারতের এই নব রাজপুতানায় পদ্মিনীরাও থাকবে বীরদের প্রেরণা দিতে। মনে পড়ল অনুত্তমের।

মনে পড়ল আর মনে হলো এই সেই পদ্মাবতী যার ধ্যান করে এসেছে সে এতদিন। এই সেই বিপ্লবী নায়িকা, সেই চিরন্তনী নারী। কে জানে কী এর নাম, কিন্তু রওশন নামটাও সার্থক। রওশন রোশনি রোশনাই। তুমি যে আছো, তোমাকে যে দেখেছি, এই আমার অনেক। তোমার কাজে লাগতে পেরেছি, এই আমার ভাগ্য। আমি ধন্য যে আমি তোমার দু'দিনের দু'রাত্রির সহযাত্রী। এখনো বিপদ কাটেনি, ধরা পড়বার সম্ভাবনা পদে পদে। তবু ধন্য, তবু আমি ধন্য।

গোয়ালন্দে নেমে অনুত্তমরা ফরিদপুরের দিকে গেল না, কাটল নাটোরের টিকিট। আবার আলাদা আলাদা কামরায় ওঠা। দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ। তারপর পোড়াদায় নেমে কলকাতার টিকিট কেটে গাড়ী বদল করল। এবার আলাদা আলাদা কামরায় নয়, একত্র। সময় ছিল না অত খুঁজতে। ভয় নেই বলে মুখ খুলে রাখল রওশন।

প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিল জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে। বোরখা পরে কি মানুষ বাঁচে! অনুত্তমকে বলল, "হুজুরের আপত্তি নেই তো?"

অনুত্তম কী যেন ভাবছিল। অন্য মনে বলল, "না, আপত্তি কিসের?"

কলকাতায় নেমে ঘোড়ার গাড়ী করে ওরা শ্যামবাজার যায়। সেখানে ওদের ছাড়াছাড়ি। গাড়ীতে রওশন বলেছিল সে আত্মরক্ষার জন্যে পালিয়ে আসেনি, এসেছে পার্টির কাজে।

কান্তিমতীর অন্বেষণ

কান্তির যাত্রা দক্ষিণ মুখে। হাওড়া স্টেশনে মাদ্রাজ মেল দাঁড়িয়েছিল, তুলে দিতে এসেছিল অনুত্তম, সুজন, তন্ময়। বাড়ীর লোক কেউ আসেনি। তাদের অমত। তাই বাড়ী থেকেও কিছু আনা হয়নি। বন্ধুরা জোগাড় করে যা দিয়েছিল তাই তার সম্বল।

"এই ভালো।" কান্তি বলল ব্যথা চেপে, "বোঝা আমার হাল্‌কা। যেমন ভ্রমণে তেমনি জীবনে। হৃদয় আমার ভারাক্রান্ত নয়। হবেও না।"

ট্রেন চলে গেল তাকে বহন করে দক্ষিণ ভারতে। সেখানে তার বছর আড়াই কেমন করে যে কেটে গেল তার হিসাব রাখে না সে নিজে। দক্ষিণী নৃত্যকলা মন্দিরকেন্দ্রিক। মন্দিরে মন্দিরে দেব-দাসীদের নাচ দেখে গুরুস্থানীয়দের কাছে ভরতনাট্যম্‌ শিখে নৃত্য সম্বন্ধে তার ধারণার আমূল পরিবর্তন হলো। সে ভেবেছিল ওটা সামাজিক জীবনের অঙ্গ। তা নয়। ওটা দেবতার সঙ্গে কথোপ-কথনের ভাষা। এক প্রকার দেবভাষা বলতে পারো। তেমনি ব্যাকরণ-শুদ্ধ, সূত্রবদ্ধ। দেবতা স্বয়ং নর্তক। নটরাজ। রঙ্গনাথ। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে, গ্রহনক্ষেত্রের নাটমন্দিরে তিনিও নৃত্যপর। সৃষ্টিকর। প্রলয়ঙ্কর।

ভরতনাট্যম্‌ কোনো রকমে আয়ত্ত করে কথাকলি শিখতে কোচিনে গেল কান্তি। কথাকলি মন্দিরকেন্দ্রিক নয়, গ্রামকেন্দ্রিক। তার জন্যে দল চাই, পৌরাণিক কাহিনী জানা চাই, পালার বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর অভিনয়ের ভাষাও বিভিন্ন। সে ভাষা মুদ্রাময়। কান্তি কিছু দিন দেখে ছেড়ে দিল। কারণ নর্তক তৈরি করা যেমন কঠিন তার চেয়েও কঠিন দর্শক তৈরি করা। দর্শক যদি মুদ্রার অর্থ না

বোঝে তা হলে নর্তকের মনের কথাই বুঝল না।

কথাকলিতে ভঙ্গ দিয়ে কান্তি চলল উত্তর মুখে। গুজরাতের গরবা তার কাছে বেশ সহজ লাগল। তার প্রকৃতির সঙ্গে মিল ছিল বলে সহজ। মিল ছিল রাজস্থানের লোকনৃত্যেরও। সেও যেন ব্রজের গোপগোপীদের একজন। সেও যেন আদিম ভীল উপজাতির মতো বন্য। মাস ছয়েক কাটিয়ে দিল কাঠিয়াবাড়ে, রাজপুতানায়। মথুরায়, বৃন্দাবনে। তার পরে উত্তর ভারতের নাগরিক বিলাসনৃত্যে গা ঢেলে দিল। বাঈ নাচ, কথক নাচ। হাস্য লাস্য বিলোল কটাক্ষ। শৌখীন, সম্ভ্রান্ত, ক্ষীয়মাণ, ক্ষয়িষ্ণু। অমন করে আপনাকে দুর্বল করা ক'দিন চলতে পারে? বছর ঘুরতে না ঘুরতে কান্তি কলকাতা ফিরে গেল। সেখান থেকে গেল মণিপুর।

মণিপুরে অপেক্ষা করছিল তার জন্যে সব চেয়ে বড় সম্পদ। আনন্দ। হাঁ, এরই নাম কেলি, এরই নাম লীলা। দক্ষিণের মতো ক্লাসিকাল নয়, উত্তরের মতো নাগরিক নয়, পশ্চিমের মতো লোক নয়, পূর্ব প্রান্তের এই নৃত্যপদ্ধতি রসে ভরা নৈসর্গিক। এর ছন্দ ধরতে কান্তির মতো অভিজ্ঞের তিন চার মাস লাগার কথা, কিন্তু এর লালিত্য তার ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গেল, ধরা দিল না বারো চোদ্দ মাসের আগে। রাসলীলার রাত্রে কৃষ্ণনৃত্য করে তার অঙ্গ শীতল হলো। মধুর, মধুর, অতি মধুর। কলামাত্রেরই সার কথা মাধুর্য। কান্তির মনে হলো সে উত্তীর্ণ হয়েছে।

মধুরেণ সমাপয়েৎ। মণিপুর থেকে সে কলকাতা ফিরে এলো। কিন্তু স্থির হয়ে এক জায়গায় বসে থাকা তার ধাতে নেই। একটা বিদেশী নটসম্প্রদায়ের সঙ্গে ভারতব্যাপী সফরে বেরিয়ে সে তাদের পরিচালন কৌশল শিখে নিল। তাদের নৃত্যপ্রকরণের সঙ্গেও পরিচিত হলো। তাদের সঙ্গে ইউরোপে যাবার সুযোগ জুটেছিল, কিন্তু তার পক্ষপাতীরা তাকে যেতে দিল না। তাকে নিয়ে তারা

একটা সম্প্রদায় গড়ল বিদেশী ছাঁচে। দেশ ক্রমশ নৃত্যসচেতন হচ্ছিল। ভদ্রঘরের মহিলারাও যোগ দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু নৃত্যকে তাঁদের সারাজীবনের সাধনা করতে তখনো প্রস্তুত হননি। সারাজীবনের জন্যে ঘর গৃহস্থালী। দু'দিনের জন্যে নৃত্য।

বম্বের ভাটিয়া পারসী গোয়ানীজ তরুণ তরুণীদের নিয়ে সেই যে সম্প্রদায় গঠিত হলো তার মূলধন ছিল উৎসাহ। তাই নিয়ে তারা শুরু করে দিল কথাকলি মণিপুর ও ভরতনাট্যমের সমাহার। নিন্দুকেরা বলাবলি করল এটা পাশ্চাত্য ব্যালে'র অনুকরণ। তা শুনে নাচিয়েরা বলল, চল আমরা বিশ্বভ্রমণে যাই, পাশ্চাত্যের লোক দেখে বলুক এটা তাদের অনুকরণ কি না। এ পোড়া দেশে গুণের আদর নেই। এরা আমাদের চিনবে না।

কিন্তু জহুরী যারা তারা চিনল ঠিকই। দেখতে দেখতে একটির পর একটি কন্যারত্নের বিবাহ হয়ে গেল। তাদের যারা নৃত্যসহচর তারা মাথায় হাত দিয়ে বসল। নেচে সুখ কী যদি একা নাচতে হয়। দক্ষিণ ভারতের যিনি নটরাজ তাঁর সঙ্গেও একটি পার্বতী দেওয়া হয়েছিল। উত্তর দক্ষিণ সমন্বয়। তিনি তো মনের দুঃখে বিবাগী হয়ে গেলেন। আর নাচবেন না বললেন। ভাঙা দল নিয়ে কান্তি কী করে সাগর পাড়ি দেয়? মণিপুরী কৃষ্ণের সঙ্গে গুজরাতী রাধা সাজবে কে? সুমতি এখন বৌ হয়ে চলে গেছে সুরতে। সেখানকার এক তুলোর ব্যাপারীর কনিষ্ঠ পুত্রবধূ রূপে।

সে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিল এ ধরণের দল টিকতে পারে না। ভদ্রঘরের তরুণীরা বিয়ে একদিন করবেই। গুরুজনের ইচ্ছা, নিজেদেরও অনিচ্ছা নেই। তখন তাদের নৃত্যসহচরদের নাচের তাল কেটে যাবে। নতুন সহচরীর অভাব হবে না, কিন্তু তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে সময়ের অভাব হবে। ততদিন তাদের সঙ্গে 'চলি চলি পা পা' করতে করতে নিজেরাই নাচ ভুলে যাবে। তার তো

ততদিন ধৈর্যই থাকবে না। তার বন্ধু শাপুরজী কিন্তু অবুঝ। বলে, "বাঙালীরা একটুতেই হাল ছেড়ে দেয়। সমস্যা তো আছেই, তার মীমাংসাও আছে নিশ্চয়। ধীরে সুস্থে করো। প্রথম ধাক্কায় কাৎ হয়ে পড়ছ কেন?"

কান্তি ভাবতে আরম্ভ করেছিল এসব নৃত্য দক্ষিণ ভারতে দেবদাসীরা উত্তর ভারতে বাঈজীরাই রক্ষা করে এসেছে প্রধানত। গড়তে হলে তাদের নিয়েই সম্প্রদায় গড়তে হবে। তারা বিয়ে করবে না, বিয়ে করবামাত্র নাচ ছেড়ে দেবে না। সারাজীবনের সাধনাকে তারা ঘর গৃহস্থালীর চেয়ে ভালোবাসে। শাপুরজী এ কথা শুনে লাল। "তোমরা হিন্দুরা চিরকাল এই করে এসেছ, এই করতে থাক চিরকাল। আমরা এর মধ্যে নেই। গোপনে যাই করি না কেন, প্রকাশ্যে একপাল বারবনিতা নিয়ে ঘুরতে পারব না। বিশ্বভ্রমণ দূরের কথা, ভারত ভ্রমণেরও দুঃসাহস নেই। পারসী থিয়েটার আজকাল চলে না কেন? লোকে ওসব পছন্দ করে না।"

তারপর ভট্টজী বললেন, "আমরা সেকেলে মানুষ, আমরাও এটা কল্পনা করতে পারিনে। আমরা বাঈজীদেরও নাচতে দেখিনি ভদ্র পুরুষদের সঙ্গে। তুমি যদি ভদ্রাদের বাদ দিতে চাও ভদ্রদেরও বাদ দাও। নইলে ভদ্রদের মান ইজ্জৎ যাবে। ভারতীয় নৃত্যেরও পুনরুদয় হবে না।"

একেলে মানুষ মগনভাই বলল, "কান্তি, তুমি নৃত্য নৃত্য করে বাউরা হলে। তাই আর একটা দিক তোমার নজরে পড়ছে না। ভদ্র-ঘরের মেয়েদের সঙ্গে নাচলে আমরাও নিরাপদ থাকি। নইলে আমাদেরও একটির পর একটির পতন হতো। তোমারও।"

কান্তি বাধা দিয়ে বলল, "না, আমার না।"

কেউ বিশ্বাস করতে চাইল না তার কথা। যেখানে মুনিদেরও মতিভ্রম সেখানে কান্তির মতি স্থির থাকবে! শোনো, শোনো।

দল ভেঙে গেল। কারণ কান্তিই ছিল তার প্রাণ। সে একদিন নিরুদ্দেশ হলো সঙ্গে কিছু না নিয়ে। বোঝা হাল্‌কা হলেই সে বাঁচে।

অন্য কারণে তার মন ভারী ছিল। সে কথা কাউকে বলতে পারে না। বলত মন্ত্রীপুত্র কোটালপুত্র সওদাগরপুত্রদের। কিন্তু কোথায় তারা কে জানে! কে কার খোঁজ রাখে!

তার কান্তিমতীর অন্বেষণ ক্ষান্ত ছিল না। যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, আলাপ হয়েছে, নৃত্যের সুযোগ হয়েছে তাদের সকলেই তো কান্তিমতী। কেই বা নয়! কারো কেশ ভালো লেগেছে, কারো বেশ ভালো লেগেছে, কারো চাউনি, কারো চলন। কারো হাসি ভালো লেগেছে, কারো কান্না ভালো লেগেছে, কারো কোপনতা, কারো শরম। কারো মুদ্রা ভালো লেগেছে, কারো ভঙ্গী ভালো লেগেছে, কারো পদপাত, কারো পরশ।

না, সে বলতে পারল না যে এরা কেউ কান্তিমতী নয়, কান্তিমতী হচ্ছে এক এবং অদ্বিতীয়। তার বহুচারী মন কোনোখানে স্থিতি পেলো না। যদিও ঠাঁই পেলো সবখানে। প্রীতিও পেলো কোনো কোনোখানে। এই তো সেদিন সুমতির কাছে। সুমতির বিয়ের খবর সে-ই জানত সকলের আগে। খবর দিয়েছিল সুমতি স্বয়ং। বলেছিল, "এ বিয়ে আমি করতে চাইনে যদি আর একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়।"

"আর একজনটি কে?" প্রশ্ন করেছিল কান্তি।

"তুমি কি জানো না যে আমাকে লজ্জার মাথা খেয়ে জানাতে হবে? বাধাও তো নেই।"

"বাধা আছে। যে পাখী আকাশের তাকে আমি নীড়ে ভরতে গেলে আকাশ তো যাবেই, নীড়ও যাবে। আর আমাকেই বা সে নীড়ে ধরে রাখতে পারবে কেন? সুমতি, তুমি বিয়ে করতে চাও করো,

কিন্তু বিয়ে না করলেই আমি সুখী হতুম।”

“বিয়ে না করেই সারাজীবন কাটবে, এ কি কখনো সম্ভব! জানো তো, রূপযৌবন দু'দিনে ঝরে যায়। তার পরে নাচবে কে? নাচ দেখবে কে? বাকী জীবন কী নিয়ে কাটবে? কাকে নিয়ে? বিয়ে তোমাকে করতেই হবে, কান্তি। আজ না হয়, বিশ বছর বাদে। ততদিন আমি কি তোমার সঙ্গে নাচতে পারব? রূপযৌবন থাকলে তো?”

সব সত্যি। তবু কান্তি বলেছিল, “এখন তুমি বিয়ে না করলেই সুখী হতুম, সুমতি। হয়তো ততদিন অপেক্ষা করতে পারতে না, কিন্তু কিছুদিন অন্তত পারতে। তবে অপেক্ষা করে ফল হতো না, ঠিক। বিয়ে আমি করতে চাইতুম না তখনো। করব না কোনো দিন। করব না কাউকেই।”

সুমতি বিশ্বাস করল না। মুচকি হেসে চলে গেল। বলল, “আমি তো বাঙালীন নই।”

মধ্যভারতের এক মহারাজা তখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নৃত্যবিদ্ আনিয়ে তাদের সহযোগিতায় তাঁর নিজের খেয়ালখুশি-মতো পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন। বাঈজী শ্রেণী থেকেই তাঁকে নর্তকী সংগ্রহ করতে হয়েছিল। এঁরা যেমন তেমন বাঈজী নন, শিক্ষায় সহবতে সাধনায় ও পরিশ্রমে এক একটি নক্ষত্র। দরবার থেকে এঁদের বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল, সুতরাং ইতরবৃত্তির প্রয়োজন ছিল না। তবে লোকে বলে রাজকীয় অতিথিদের সঙ্গে রানী না থাকলে এঁরাই রানীর মর্যাদা পেতেন।

কান্তির নাম ইতিমধ্যেই মহারাজের দরবারে পোঁছেছিল। মানুষটিকে দেখে মহারাজ তৎক্ষণাৎ নিয়োগপত্র দিলেন। বললেন, “তোমাকেই আমি খুঁজছিলুম। তুমি এলে, এখন অঙ্গহানি দূর হলো। মন দিয়ে লেগে যাও। কেউ হস্তক্ষেপ করবে না।”

নৃত্যের স্টুডিও ছিল কান্তির স্বপ্ন। সুসজ্জিত স্টুডিওর অভাব সে পদে পদে বোধ করছিল। মহারাজের স্টুডিও নেই, যা আছে তাকে স্টেজ বলা যায়। কান্তি বলল, "ইয়োর রয়াল হাইনেস, ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি"

"বলো, বলো, কী বলতে চাও বলেই ফেল।"

"জাঁহাপনা, এ যে স্টুডিও নয়। এ যে স্টেজ।"

"হাঁ, হাঁ, ইস্টেজ, ইস্টেজ। ইস্টুডিও ক্যা চীজ?"

"আমার কাছে ফোটো আছে। দেখাব। রাশিয়ান ব্যালে'র জন্যে ডিয়াগিলেফ যা ব্যবহার করতেন। নিজিনস্কী যেখানে অনুশীলন করতেন।"

"ডিয়াগিলেফ কৌন আদমী? নিজিনস্কী কৌন আওরৎ?" মহারাজ তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের দিকে তাকান আর দাড়ি চোমরান।

কেউ বলতে পারে না। কান্তিই বলে, "নিজিনস্কী আওরৎ নন, পুরুষ। এ যুগের শ্রেষ্ঠ নর্তক। বোধ হয় পূর্বজন্মে গন্ধর্ব ছিলেন। ইদানীং পাগলা গারদে। আর ডিয়াগিলেফ সম্প্রতি মারা গেছেন। তিনি ছিলেন রাশিয়ান ব্যালে'র পরিচালক।"

সাঙ্গোপাঙ্গরা ধরা পড়ে অপ্রতিভ হলেন। মহারাজ ফোটো দেখে তাজ্জব বনলেন। তারপর স্টুডিও নির্মাণের ফার্মান বার হলো। কান্তি যেমনটি চায়। তিন মাসের মধ্যে বাড়ী তৈরি। চার মাসের মধ্যে কাঠের মেজে। ছ'মাসের মধ্যে সাজ সরঞ্জাম। তার পরে শুরু হলো কান্তির পরিচালনায় নতুন ধরণের তালিম। সে কেবল শেখায় না, দেখায়। লালিত্যে ও মাধুর্যে সে রাজ্যে তার সমকক্ষ ছিল না। আগন্তুকদের মধ্যেও না।

তার নৃত্যসহচরী হলো লায়লা জান। রাজনর্তকী মেহের জান যার মা। লায়লার সঙ্গে কোনো ভদ্র যুবক আর কখনো নাচেনি, লায়লা যেন কৃতার্থ হয়ে গেল, ধন্য হয়ে গেল। ধন্য হয়ে তার শ্রেষ্ঠ

যা কিছু তাই এনে দিল নৃত্যবেদীতে। তার নটীর পূজার অর্ঘ। আর কান্তি আপনাকে ভাগ্যবান মনে করল সত্যিকারের একজন শিল্পীর সাহচর্য পেয়ে। যাকে পাখী পড়া করে শেখাতে হয় না, যার ভুল দেখে বিরক্ত হতে হয় না, যে কাঠের পুতুল নয় যে তার দিয়ে বেঁধে নাচাতে হবে। লায়লার তুলনায় সুমতি যেন মানুষের তুলনায় পুত্তলিকা।

একজন ভাগ্যবান, আর একজন ধন্য। নাচ যা জমল তা দেখে তৃপ্তি। লায়লার প্রখর বুদ্ধি। এক পদ্ধতির সঙ্গে অপর পদ্ধতির সংমিশ্রণে নীর বাদ দিয়ে ক্ষীর নিতে সে কান্তির চেয়েও সুদক্ষ। বরং কান্তিকেই চাইতে হয় তার পরামর্শ, তার সমালোচনা। শ্রদ্ধায় কান্তির মাথা নুয়ে আসে। ভারতের বিভিন্ন ও বিচিত্র নৃত্যের সমন্বয় একটু এখান থেকে একটু ওখান থেকে নিয়ে জুড়ে জুড়ে হবে না। হবে একটি বিশেষ ঐতিহ্যকে ঘিরে, একটি বিশেষ পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে, তার চারদিকে আর সমস্তকে বিনুনির মতো বুনে।

কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা, লায়লার নৃত্যে এমন একটা দরদ ছিল যা হাজার তালিম সত্ত্বেও সুমতির নৃত্যে আসত না। হাজার অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও কান্তির নৃত্যে আসবে না। এটা সাধনলব্ধ নয়। কান্তি একদিন লায়লাকে জিজ্ঞাসা করল, "লায়লী, এ তুমি কোথায় পেলে?"

সে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। ধীরে ধীরে সজল হলো তার সুরমা-আঁকা আঁখিপল্লব। ক্ষীণ স্বরে বলল, "জীবনের কাছে।"

"তোমার জীবন কি—" কান্তি বলতে বলতে থেমে গেল।

"কান্তি," সে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল, "তুমিই একমাত্র পুরুষ যে আমাকে ঘৃণা করেনি, হীন জ্ঞান করেনি, মৌখিক ভদ্রতা জানায়নি, ক্ষুধা মেটাবার খাদ্য মনে করেনি। তোমার কাছে আমার গোপন করবার কী আছে?"

কান্তির চোখে জল এলো। মুখে কথা জোগাল না। কান সজাগ

হলো।

"বড় দুঃখের জীবন আমাদের। মহারাজার কখন কে অতিথি আসবেন, তার জন্যে আমরা বাঁধা। নিমক খাই, হারামি করতে পারি কি?"

কান্তি যে জানত না তা নয়। কিন্তু তার বিশ্বাস ছিল এটা একটা প্রথা। সইতে সইতে সব প্রথার মতো এটাও গা-সওয়া হয়ে যায়। নইলে নৃত্যকলা রক্ষা পাবে কী করে? রক্ষিতারাই রক্ষা করে এসেছে। আবার রক্ষিতাদের রক্ষক হয়েছে রাজ্যের রাজা, মন্দিরের ব্রাহ্মণ। পাপ? এর মধ্যে পাপ যদি থাকে তবে পাপের শোধন হয়ে যায় নটরাজের উপাসনায়, কলাদেবীর আরাধনায়।

কিন্তু লায়লা যা বলল, যেমন করে বলল, তাতে কান্তির বহু-দিনের বদ্ধমূল ধারণার মর্মে আঘাত লাগল। হু হু করে উঠল তার হৃদয়। চোখের জলে মুখ ভেসে গেল। নারীর অপমানের উপর যার প্রতিষ্ঠা সে কিসের শিল্প, সে কিসের সাধনা! লায়লা কি নারী নয়? তার কি অপমানবোধ নেই? কান্তিমতী রাজকন্যা কি আর সব নারীতে আছে, লায়লাতে নেই?

আছে। আছে। এও সেই কান্তিমতী। কখনো রাধানৃত্যে, কখনো পার্বতীনৃত্যে, কখনো অপ্সরানৃত্যে সে তার চিরন্তন সৌন্দর্য উন্মোচন করে দেখিয়েছে। তখন মনে হয়েছে সে শাশ্বতী নারী। যে নারীর প্রতিরূপ ভারতের চেতনায় রাধা, গৌরী, উর্বশী। ইরানের চেতনায় লায়লা। গ্রীসের চেতনায় হেলেন। জুডিয়ার চেতনায় মেরী। ইতালীর চেতনায় ম্যাডোনা।

কান্তি বলল, "তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি, লায়লী?"

"কিছুই না। সব আমার নসীব।" সে দার্শনিকের মতো শান্ত।

কিন্তু কান্তির জীবনের তাল কেটে গেল। তার নৃত্যেরও।

একদিন সে কাউকে কিছু না বলে কারো কাছে বিদায় না নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। না, ভারতের নৃত্যকলার পুনরুদয় ও ভাবে হবে না। সমাধানের জন্যে অন্য উপায় দেখতে হবে। অতীতে যা কার্যকারী হয়েছে বর্তমানেই তার কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে, ভবিষ্যতে কি তা বৃদ্ধি পাবে? না। নারীকে পতিতা করে তার পতনের উপর যা দাঁড়িয়েছে তা মন্দিরই হোক আর প্রাসাদই হোক তা পতনোন্মুখ। কান্তি তার সঙ্গে আপন ভাগ্য যোগ করে পতিত হবে না। ভারতের নারী যদি নর্তকী হয়ে গ্লানি বোধ করে তবে নারীকে সে ডাকবে না সারাজীবনের জন্যে নৃত্যসাধনা করতে।

অশান্ত হৃদয় নিয়ে সে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ালো, ভুলে গেল যে সে শিল্পী। ক্রমে বুঝতে পারল আদর্শ অবস্থার জন্যে অপেক্ষা করলে চলবে না। সুমতিদের নিয়ে, লায়লাদের নিয়ে কাজে লেগে যেতে হবে। পরে যারা আসবে তাদের জন্যে বসে থাকলে কাজ হবে না। আসবে তারা একদিন, আসবেই। যেমন এসেছে ইউরোপে আমেরিকায় তেমনি আসবে ভারতে। আধুনিক নারী। যে পতিতা নয়, যে শিল্পের খাতিরে অবিবাহিতা কিংবা বিবাহ করলেও শিল্প-চর্চায় নিবেদিতা।

আবার সম্প্রদায় গঠন। এবার কলকাতায়। যা সে আশা করেনি তাই ঘটল। দলে যোগ দিল একটি দুটি করে বেশ কয়েকটি বিবাহিত মেয়ে, তাদের স্বামীরাও। এরা অবশ্য কিছুতেই লায়লার মতো মেয়েদের আসতে দেবে না। তা ছাড়া আর কোনো খেদ রইল না কান্তির মনে। কী করে লায়লাকে উদ্ধার করবে এ চিন্তা তাকে অনবরত পীড়া দিচ্ছিল।

এবার দেখা দিল নতুন এক সমস্যা। তার নৃত্যসহচরী হলো মীনাক্ষী। তাতে শ্যামলের আপত্তি। শ্যামল ওর স্বামী। বেচারার নাচতে শখ। কিন্তু নাচে নিজের খেয়ালে। আড়াই বছরের শিশু

ভোলানাথের মতো। মীনাক্ষীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে এই তার নাচের যোগ্যতা। কান্তি তার নাচের দাবী নাকচ করায় সে দারুণ দুঃখ পেলো। কিন্তু তার বিয়ের দাবী নাকচ করা অত সহজ নয়। সে হলো স্বামী। স্বামী যদি অনুমতি না দেয় তা হলে স্ত্রী কেমন করে অপরের সঙ্গে নাচবে?

কান্তি তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বলল, "শ্যামল, তোমার মনে যে শঙ্কা জাগছে সেটা অমূলক। আমার নৃত্যসহচরী কোনো দিন নর্মসহচরী হবে না। কোনখানে লাইন টানতে হয় সে আমি জানি। যদি না জানতুম তা হলে এত দিন সব প্রলোভন তুচ্ছ করলুম কোন মন্ত্রবলে?"

শ্যামল অভিভূত হয়ে বলল, "কান্তিদা, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু ঐ যে তোমার পণ—বিয়ে করবে না, ওর তাৎপর্য কী?"

এরূপ প্রশ্ন এই প্রথম। অবাক হলো কান্তি। তখন শ্যামল বলে চলল, "ওর তাৎপর্য কি এই নয় যে তোমার জন্যে আমি বিয়ে করব, আর তুমি আমার বিয়ের সুযোগ নেবে?"

সর্বনাশ! মানুষের মনে কত ময়লা যে আছে! কান্তি কী উত্তর দেবে ভাবছে, শ্যামল আবার বলল, "তুমিও বিয়ে করে ফেল, কান্তিদা। নইলে দল রাখতে পারবে না। তার পর তোমার যদি পছন্দ হয় তুমি মীনাক্ষীর সঙ্গে নাচবে, আর আমি নাচব বৌদি'র সঙ্গে। কেমন? অন্যায় বলেছি? এটা কি অন্যান্য স্বামীদেরও মনের কথা নয়?"

হা ভগবান! কান্তি একবার আকাশের দিকে তাকাল। একবার শ্যামলের দিকে। তারপর বলল, "শ্যামল, আমাকে বিশ্বাস করো। আমি যখন যার সঙ্গে নাচি তখন তার সঙ্গে আমার নিষ্কাম সম্পর্ক। সৌন্দর্য ভিন্ন আর কিছু আমি দেখিনে। ফুল দেখে আমি আনন্দ পাই, ছিঁড়তে যাইনে। এর মধ্যে কোনো দুরভিসন্ধি নেই, চাতুরী নেই, শ্যামল। ভুল বুঝো না আমাকে।"

শ্যামল নিরস্ত হলো। কিন্তু কয়েক মাস পরে কান্তির নিজেরই টনক নড়ল। মীনাক্ষী তার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল যার অর্থ, যদস্তি হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর। বম্বে। অনুত্তম গেছে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের সন্দেশ নিয়ে সরদার বল্লভভাই সকাশে। সুভাষের সঙ্গে নাকি কংগ্রেস হাই কমান্ডের বনিবনা হচ্ছে না, মিটমাটের চেষ্টায় চরকীর মতো বনবন করছে অনুত্তম। চরকা গেছে চুলোয়। ঐ যে খদ্দরের ঝোলাটা ওর জায়গা নিয়েছে চামড়ার ব্রীফকেস। তাতে আছে রাজনৈতিক কাগজপত্র। একান্ত গোপনীয়। নীল চশমাটা তেমনি আছে। তবে তার ফ্রেমটা সোনা হয়ে গেছে। যে পরশপাথরের ছোঁয়া লেগেছে চশমার ফ্রেমে তারই ছোঁয়া লেগেছে সারা অঙ্গে। কটিবস্ত্র হয়েছে কোঁচানো ধুতী, তুলে না ধরলে ধুলোয় লুটোত। খালি পা ঢাকা পড়েছে শাদা লপেটায়, মাটির সঙ্গে তার সংযোগ ছিন্ন। খাটো কুর্তি এখন পুরো পাঞ্জাবী, তার উপর হাতকাটা জবাহর-কোট।

চেহারাটা কিন্তু খারাপের দিকে। রোদের তাতে পুড়ে বৃষ্টির জলে ভিজে ঝড়ের ঝাপটা সয়ে উইয়ের কামড় খেয়ে শুকনো ডালের যে দশা হয় অনুত্তমেরও তাই। ভাঙাচোরা কাঠখোট্টা হাড় বার-করা চুল-পাতলা। সন্ত্রাসবাদী বলে সন্দেহ বশত বাংলাদেশের সরকার তাকে প্রথমে কয়েদ করে, তারপরে অন্তরীন করে। পাঁচ ছ'বছর কেটে যায় বক্সায়, দেউলিতে, অজ পাড়াগাঁয়। পরে হাসপাতালে। অথচ সন্ত্রাসবাদী সে কোনো কালেই ছিল না। শুধু রওশনের জন্যে এ দুর্ভোগ। যাক, তার ফলে সুভাষের সুনজরে পড়েছে। "আমি অনুত্তম, সুভাষদার কাছ থেকে আসছি," যেখানে যায় সেখানে এই তার পরিচয়পত্র। ছাড়পত্রও বটে, কংগ্রেসশাসিত প্রদেশের পুলিশ এ কথা শুনলে "নমস্তে" বলে হটে যায়। কেবল বাংলাদেশের ওরা আঠার মতো লেগে থাকে। সেই জন্যেই তো হাই কমান্ডের উপর

তার অভিমান।

অনুত্তম মেরিন ড্রাইভ থেকে চৌপাটি হয়ে মালাবার পাহাড়ে যাচ্ছিল, একজন মন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রণা করতে। উল্টো দিক থেকে আসছিল আর একখানা মোটর। মুখোমুখি হতেই ও মোটরটা গেল থেমে। ড্রাইভারের সীট ছেড়ে বেরিয়ে এলো এক মিলিটারি সাহেব। হাত বাড়িয়ে দিয়ে অনুত্তমের ড্রাইভারকে ইশারা করল গাড়ী থামাতে। অনুত্তম তো রেগে বেগুনী। কংগ্রেসশাসিত প্রদেশে এই অনাচার! মন্ত্রীরা তা হলে করছে কী! দেখে নেব মুন্শীকে। গাড়ী থেকে নেমে পড়ে রাগত ভাবে বলল, "আমি অনুত্তম, রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে আসছি।"

"আর আমি তন্ময়, পুনা থেকে আসছি।" বলে হো হো করে হেসে উঠল সাহেব।

ঝাঁকানি ও কোলাকুলির পর দুই বন্ধুর খেয়াল হলো যে রাস্তার মাঝখানে গাড়ী দাঁড় করিয়ে রাখায় ট্রাফিক বন্ধ হতে বসেছে। তখন তন্ময় টেনে নিয়ে গেল অনুত্তমকে নিজের মোটরে, অপরটাকে বলল ঘুরিয়ে নিয়ে অনুসরণ করতে। ব্যালার্ড পীয়ার।

"খবর পেয়েছিস্ কি না জানিনে, সুজন আসছে কলম্বো থেকে যে জাহাজে সেই জাহাজেই কান্তি রওনা হচ্ছে ইউরোপ। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান। ভাবছিলুম তিন জনের দেখা হবে, চার জনের হবে না। অনু ভাই যদি থাকত! ভাবতে না ভাবতে তোর সঙ্গে মুখোমুখি। অদ্ভুত! অদ্ভুত! জীবনটাই অদ্ভুত! আমি আজকাল অদৃষ্টবাদী হয়েছি। আর তুই?"

"আমি? আমার কথা থাক। হাঁ রে, তুই নাকি বিয়ে করেছিস? পেয়েছিস তা হলে তাকে? তোর রূপমতীকে?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে তন্ময় বলল, "বিয়ে করেছি। এক বার নয়, দু'বার। পেয়েছি, পেয়ে হারিয়েছি। হেরে গেছি। দেখে

বুঝতে পারছিস্ নে, আমি পরাজিত?”

অনুত্তম লক্ষ্য করল তন্ময়ের মাথার চুল কাঁচাপাকা। ষণ্ডা গুণ্ডা বলীবর্দের মতো আকার, কিন্তু অসহায়ের মতো মুখভাব। দু'চোখে কতকালের জমাট কান্না। তার হাসি যেন কান্নার রূপান্তর। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তার জীবনের সব শেষ হয়ে গেছে। তবু সে বেঁচে আছে, আবার বিয়ে করেছে, চাকরিতে ভালোই করেছে বলে মনে হয়। ছেলেমেয়ে?

“ছেলেমেয়ে দুটি। কিন্তু রূপমতীর নয়। সে আমার সন্তানের মা হলো না। আমি তার শুভকামনা করি। শুভকামনা করি আর একজনেরও। আমার কপালে যে সুখ সইল না তার কপালে যেন সয়। কিন্তু সইবে কি! আমার সমবেদনা তার প্রতি।”

অনুত্তম হাঁ করে শুনছিল। স্টীয়ারিং হুইলে ছিল তন্ময়ের হাত, নইলে তাকে ধাক্কা মেরে বলত, “এসব কী, তনু ভাই। এ যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য! হাঁ রে, তুই কি পাগল হলি!”

তন্ময় ভারী গলায় বলে চলল, “কোনটা ভালো? পেয়ে হারানো? না আদৌ না পাওয়া? এক এক সময়ে মনে হয় আমি ভাগ্যবান যে আমি তাকে চোখে দেখেছি, বুকে ধরেছি, ঘরে ভরেছি, কোলে রেখেছি। এক এক সময় মনে হয় আমি পরম হতভাগ্য। আমি অসীম কৃপার পাত্র। আমার বৌ চলে গেছে আমাকে ফেলে অন্যের অন্তঃপুরে।”

অনুত্তম আর সহ্য করতে পারছিল না। ঝুনো নারকেলের মতো মানুষটা কাঁদো কাঁদো সুরে বলছিল, “ওঃ! ওঃ! ওঃ!”

তন্ময় ক্ষণকাল উদাস থেকে তার পর কখন এক সময় আবার বলতে লাগল, “ইচ্ছা ছিল ওকে অনুসরণ করব। অনুসরণই তো অন্বেষণ। কে জানে হয়তো ওর মন ফিরবে। তখন ঘরের বৌ ঘরে ফিরবে। কিন্তু ডিভোর্সের যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই দেখে ওর উকীল

৬

ওকে কুপরামর্শ দেয়। আর্জিতে লেখায় আমি নাকি সহবাসে অসমর্থ। তামাশা মন্দ নয়, প্রমাণের দায় চাপিয়ে দেওয়া হলো প্রতিবাদীর উপরে। লজ্জায়, ঘৃণায় আমি গরহাজির থাকলুম। একতরফা ডিক্রী পেয়ে সে মামলায় জিতল।"

অনুত্তম ততক্ষণে রাগে গরগর করছে। বলল, "তুই ভুল দেখেছিস্। ও রূপমতী নয়। রূপমতী হলে এমন কাজ করত না।"

তন্ময় হেসে বলল, "ঐখানে তোর সঙ্গে আমার মতভেদ। পদ্মাবতীর পরিচয়—করা না করায়। রূপমতীর পরিচয়—হওয়া না হওয়ায়। ও যে রূপমতী হয়েছে এটা জাগ্রত সত্য। কাজটা যদিও নিন্দনীয়। চরিত্রের ত্রুটী তো রূপের অপূর্ণতা নয়। তা সত্ত্বেও আমি ওকে ফিরে পেতে রাজী ছিলুম। ইচ্ছা ছিল না আর একটা বিয়ে করতে। কিন্তু যেখানে যাই সেখানে আমাকে দেখে কৌতুকের বিদ্যুৎ খেলে যায়। আমি যেন একটা সঙ্। টেনিসের ছোকরাগুলো পর্যন্ত ফিসফিস করে বলে, এ সাহেব মর্দানা নয়!"

"ওদের দোষ কী! আমি তোর বন্ধু না হলে ও ছাড়া আর কী বলতুম!"

"ক্লাব ছেড়ে দিলুম। মেসে যাইনে। কিন্তু টেনিস? টেনিস যে আমার প্রাণ। তা বলে রোজ রোজ ও কথা বরদাস্ত হয় কখনো? স্থির করলুম বিয়েই করব আরেকবার। বিধাতা বিমুখ না হলে প্রমাণও করব যে আমি অশক্ত নই। তার পর জীবনে দ্বিতীয় সুযোগ এলো। রূপবতী নয়, সাধ্বী সতী।"

অনুত্তম খুশি হয়ে বলল, "সেই ভালো। সেই ভালো। কিন্তু এখন থাক। পরে শুনব সব বৃত্তান্ত। ঐ তো ব্যালার্ড পীয়ার দেখা যাচ্ছে। সুজনের সঙ্গে কান্তির সাক্ষাৎ হবে। আঃ! কী আনন্দ! কত কাল পরে, বল দেখি। চো-দ্দ ব-ছ-র। রামের

বনবাস। ওঃ!”

ব্যালার্ড পীয়ারে জাহাজ ভিড়তে যাচ্ছে এমন সময় এরা পৌঁছয়। সুজনের মতো কে যেন ডেকের উপর দাঁড়িয়ে। হাত নাড়ল এরা। হাত নাড়ল সেও। তার পর জাহাজ যতই কাছে আসতে লাগল ততই পরিষ্কার মালুম হতে থাকল সে সুজনই বটে। মাথায় চকচকে টাক। ভুঁড়িটি তুলো ভরা তাকিয়ার মতো। কেবল মুখখানা তেমনি স্বপ্নবিভোর, তেমনি কোমল মধুর।

জাহাজ ভিড়তেই এরা দু' বন্ধু সোজা উঠে গেল গ্যাংওয়ে বেয়ে। জড়িয়ে ধরল ওকে।

“তন্ময় ভাই! অনুত্তম ভাই!”

“সুজন ভাই! সুজন ভাই!”

“তোরা কে কেমন আছিস, ভাই?”

“তুই কেমন আছিস, ভাই?”

“হবে, হবে সব কথা। কিন্তু কান্তি ভাই কোথায়? তার খবর?”

“কান্তি এইখানেই আছে। এই জাহাজেই রওনা হচ্ছে কণ্টিনেণ্টে।”

“চমৎকার! তা হলে চল নামা যাক।”

ভারতের মাটিতে পা ঠেকানোর জন্যে সুজন অধীর হয়ে উঠেছিল। আর সকলের কাছে মাটি, তার কাছে মৃণ্ময়ী মা। গুন গুন করে গান ধরল, “ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।” এবং সত্যি সত্যি মাটিতে পা ঠেকানোর সঙ্গে সঙ্গে এক বার হাত ছুঁইয়ে মাথায় ঠেকালো। তার চোখে জল এসে গেল।

“তেমনি সেণ্টিমেণ্টাল আছিস্, দেখছি।” তন্ময় বলল স্নেহ-ভরে।

“দেশের জন্যে দরদ কত!” অনুত্তম বলল খোঁচা দিয়ে। “দমন-

নীতির যুগটা বিদেশে গা-ঢাকা দিয়ে কাটালি। তার পর সিংহলে গেলি কোন দুঃখে!"

"কেন? তোর কি মনে নেই যে আমি একজনের অন্বেষণের ভার নিয়েছিলুম?"

"ওঃ! কলাবতীর অন্বেষণে লঙ্কায়! রাক্ষসের দেশে! হাঁ, রূপকথায় সেই রকমই লেখে বটে। রাক্ষসরাক্ষসীদের মেরে রাজকন্যাকে উদ্ধার করেছিস্, না প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছিস্, তাই বল।"

"আরে না, সেসব কিছু নয়। বকুল আছে ওখানে, ওর সঙ্গে আট ন'বছর দেখা হয়নি। কবে আবার হবে এই ভেবে কলম্বো দিয়ে ফিরি। কথা ছিল সোজা মাদ্রাজ হয়ে কলকাতা যাব, কিন্তু যা দেখলুম তার পরে তন্ময়ের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছাই প্রবল হলো। চলে এলুম বম্বে। জলপথই ভালো লাগে আমার।"

তন্ময় কৌতূহলী হয়েছিল। অনুত্তমও গম্ভীরভাবে কৌতূহল গোপন করছিল।

"বল, বল, কী দেখলি কী শুনলি।"

সুজন তার হাতে হাত রেখে কানে কানে বলল, "তোর রূপমতীকে দেখলুম।"

তন্ময়ের মুখ শাদা হয়ে গেল। সে বোবার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল। প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিতে অনুত্তম বলল, "কান্তির জন্যে কি ব্যালার্ড পীয়ারেই অপেক্ষা করা যাবে?"

তন্ময় বলল, "না, চল আমার ক্লাবে তোদের নিয়ে যাই। কান্তিকে টেলিফোন করলে সেও ওইখানে জুটবে। সুজন, তুই আমার সঙ্গে পুনা যাবি, দু'চার দিন থাকবি। আর অনুত্তম, তোর অবশ্য জরুরি কাজ আছে। তোকে পুনায় টানব না। কিন্তু ক্লাবে টানব।"

"ক্লাব!" অনুত্তম বলল রঙ্গ করে, "ক্লাবে যাচ্ছি জানলে একটা

বোমা কি রিভলভার জোগাড় করতুম। ষাঁড়ের কাছে যেমন লাল ন্যাকড়া সন্ত্রাসবাদীদের কাছে তেমনি ক্লাব।"

তন্ময়ের ক্লাবের নাম ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া। সেখানে তার দারুণ খাতির। তার মাথায় কিন্তু তখনো ঘুরছিল সুজন কী দেখেছে কী শুনেছে। কথায় কথায় আবার ঐ প্রসঙ্গ উঠল।

"আমি কি জানতুম যে ওই তোর রূপমতী? চোখ ঝলসানো রূপ দেখে ভাবছি কে এই অপ্সরা। শুনলুম রামায়ণের ফিল্ম হচ্ছে। তার শুটিংএর জন্যে বম্বে থেকে এঁরা এসেছেন। বকুলের স্বামী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্তা। সুযোগ সুবিধার জন্যে তাঁর সঙ্গে এঁদের সাক্ষাৎকার। তাঁর বাড়ী কলকাতায় শুনে রূপমতী আফসোস করলেন। তাঁরও তো স্বামীর বাড়ী কলকাতায়, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। স্বামীর নাম তন্ময়।"

সুজন আরো বলল, "তোর ঠিকানা দিলেন তিনিই।"

অনুত্তম বলল, "আর ও প্রসঙ্গ কেন? তন্ময় এখন অন্যের স্বামী, তিনিও এখন অন্যের স্ত্রী। পরপুরুষ আর পরস্ত্রীর আলোচনা কি নীতির দিক থেকে বাঞ্ছনীয়?"

কথাটা অনুত্তম সুজনকে কটাক্ষ করে বলেনি। কিন্তু সুজন ওটা গায়ে পেতে নিল। বলল, "নীতির দিক থেকে বাঞ্ছনীয় কি না নীতিনিপুণরাই বুঝবেন। আমার তো মনে হয় সত্যের দিক থেকে বাঞ্ছনীয়। নইলে আমার নিজের কাহিনী অকথিত থেকে যায়।"

"ওঃ তাই নাকি?" চমকে উঠল অনুত্তম। "তোর নিজের কাহিনী—"

"ঐ নীল চশমাটা হলো নীতির চশমা। ওর ভিতর দিয়ে দুনিয়ার দিকে তাকালে ভালো মন্দ এই দুটো জিনিসই চোখে পড়ে। যা ভালোমন্দের অতীত তার জন্যে চাই মুক্ত দৃষ্টি। সেটা নীতি-

নিপুণদের নীল চশমার সাধ্য নয়।"

অনুত্তম আহত হয়ে বলল, "তোর নিজের কাহিনী যদি অবাঞ্ছনীয় হয়ে থাকে তা হলেও আমি তা শুনব, ভাই সুজন। তা বলে আমাকে তুই দুঃখ দিস্ নে। এমনিতেই আমি দুঃখী।"

পুরাতন বন্ধুদের পুনর্মিলনে নিছক আনন্দ নেই, বেদনাও আছে। বেদনাটা এইজন্যে যে তাদের একজনের মত বা মতবাদ আরেক জনের থেকে এত বেশি ভিন্ন যে যতক্ষণ নীরব থাকা যায় ততক্ষণই শান্তি, অন্যথা অশান্তি। কবিগুরু গ্যয়টে পুরাতন বন্ধু বা প্রেমিকদের পুনর্দর্শন পছন্দ করতেন না। সুজনের ও কথা মনে পড়ে গেল।

তিন বন্ধুরই বাক্যালাপ আপনি বন্ধ হয়ে এসেছে, সিগারেট খাওয়া ছাড়া আর কিছুই যেন করবার নেই, এমন সময় হৈ হৈ করে ঘরে ঢুকল কান্তি। উল্লাসে আহ্লাদে প্রাণের উচ্ছলতায় অকৃপণ। এই একটা 'শো' দিচ্ছে তো এই একবার মহড়া দিচ্ছে। এই একজনের বাড়ী খেতে যাচ্ছে তো এই একজনের বাড়ী শুতে যাচ্ছে। এখানে ওর মাসিমা, ওখানে ওর পিসিমা, বাঙালী গুজরাতী সিন্ধী। রকমারি ভাষা শিখেছে কান্তি, কখনো উর্দু আওড়াচ্ছে, কখনো তামিল, কখনো ভাঙা ভাঙা ফ্রেঞ্চ। পারসী ও ভাটিয়া বন্ধুরা চাঁদা করে পাথেয় দিচ্ছে, তাই নিয়ে প্যারিস যাচ্ছে সদলবলে।

"তোরা তিন জনে প্যাঁচার মতো বসে আছিস্ কেন রে? ওঠ। ফোটো তোলাতে হবে। নাজুকে বলে এসেছি তৈরি থাকতে। চল।" এই বলে কান্তি অনুত্তমের টুপিতে টান দিল, সুজনের টাকে চিমটি কাটল, তন্ময়ের পিঠে থাপড় মারল।

ঘরের জমাট আবহাওয়া তরল হলো তার তারুণ্যের কিরণ লেগে। বয়সের চিহ্ন নেই তার শরীরে। তবে গভীরতার আভাস পাওয়া যায়।

"সুজনকে তো দেখছি। সুজনিকা কোথায়? বড় আশা করেছিলুম যে। নিরাশ হলুম। আর তন্ময়, তোর সঙ্গে এক বার দেখা হয়েছিল পুনায়, তোর তন্ময়িনীর সঙ্গেও। মনের মতো বৌ পেয়েছিস, আর ভাবনা কিসের! অতীতের জন্যে হা হুতাশ করে জীবন অপচয় করিস্‌নে। এই অনুত্তম, তোর দেশের কাজ কি কোনো দিন ফুরোবে না? ঘর সংসার করবিনে? বলিস্‌ তো একটি পাত্রী দেখি তোর জন্যে। একটি অনুত্তমা।"

"তোর নিজের কথা বল, আমার কথা পরে হবে।" অনুত্তম তার কাছে সরে এলো।

"আমার কথা খুব সংক্ষিপ্ত নয়, কিন্তু আমার সময় সংক্ষিপ্ত। জাহাজ ধরতে হবে। তা তুইও চল না আমার সঙ্গে এক জাহাজে? তোরাই তো গভর্নমেণ্ট। পাসপোর্ট পেতে আধ ঘণ্টাও লাগবে না। প্যাসেজ আমি দেব।"

অনুত্তম মুচকি হাসল। কান্তি কী করে জানবে কার চিঠি রয়েছে তার ব্রীফকেসে। মহামান্য আগা খাঁর। দরকার হলে সে প্যারিসে উড়ে যেতে পারে তাঁর চিঠির জবাব দিয়ে আসতে।

"কান্তি, তোর বোধ হয় মনে পড়ছে না যে পুরীতে আমরা স্থির করেছিলুম আবার যখন চার জনে মিলিত হব তখন যে যার অন্বেষণের কাহিনী শোনাব। আমার কাহিনী তো সকলে তোরা জানিস, সময় থাকলে সমস্তটা শোনাতুম। এখন তোদের তিনজনের কাহিনী শোনা যাক। ফোটোর জন্যে আমিই ব্যবস্থা করছি। জাহাজ-ঘাটেই ভালো হবে।" বলল তন্ময়।

"সুজন দেশে ফিরেছে, অনুত্তমও আর জেলে যাচ্ছে না, তন্ময় তো তার অন্বেষণ পর্ব শেষ করে দিয়েছে। আমি ইউরোপ থেকে ঘুরে আসি, তার পরে একটা দিন ফেলে আমরা চারজনে একত্র হব কোনো এক জায়গায়। তখন প্রাণ খুলে গল্প করার মতো অবসর

জুটবে। আজকের এই মিলনটা বিদায়ের ছায়ায় মলিন। ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে থেকে কি জীবনের রাগিণী বিস্তার করা যায়? এ যেন রেডিওতে গান গাওয়া। কাহিনী থাক, শুধু বলা যাক, কে কোথায় পৌঁছেছে।"

কান্তির এ প্রস্তাব সমর্থন করল সুজন। "কে কোথায় পৌঁছেছে। তন্ময়, তুই শুরু কর।"

তন্ময় বলল, "আমি একেবারে পৌঁছে গেছি। বুড়ি ছুঁয়েছি। আমার অন্বেষণের আর কোনো পর্যায় বাকী নেই। রূপমতীকে দেখেছি, চিনেছি, পেয়েছি, হারিয়েছি, হারানো সত্ত্বেও চিরকালের মতো পেয়েছি। মাত্র কয়েকটা বছরে যা অনুভব করেছি সারা জীবনেও তা হয় না। ঐ কয়েকটা বছরই আমার সারা জীবন। বাকীটা তার সম্প্রসারণ।"

"আমি," অনুত্তম বলল, "এখনো পৌঁছইনি। আমার মনে হচ্ছে সামনে আর একটা সংঘাত আসছে। ইংরেজ তার আগে নড়বে না। তার জন্যে দেশকে তৈরি করা আমার কাজ। দেশ যখন তৈরি হবে তখন সেই ঘনঘটার মধ্যে আবার আমার পদ্মাবতীর সঙ্গে আমার শুভ দৃষ্টি ঘটবে। তুই ইউরোপ থেকে ফিরে দিন ফেলতে চাস্, কান্তি। দিনটা বোধ হয় পাঁচ বছরের আগে নয়। তার আগে আমি কোথাও পৌঁছব না।"

সুজন বলল, "আমার অবস্থা তন্ময় ও অনুত্তম এ দু'জনের মাঝামাঝি। আমার কাহিনী এখনো সমাপ্ত হয়নি, কিন্তু তার সমাপ্তির জন্যে পাঁচ বছর অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন। আমার জীবনটা যে এত দীর্ঘ হবে তা কি আমি ভেবেছি? ধরে নিয়েছি কাহিনীটা শেষ হবার আগে জীবনটা শেষ হয়ে যাবে। তা যখন হলো না তখন কাহিনীটাই সংক্ষেপ করে আনব। আমার কলাবতীকে আমি কোনো দিনই পাব না, একশ' বছর বাঁচলেও পাব না। এ জন্মে

নয়। এ বিশ্বাস দৃঢ় হলো এবার কলম্বো গিয়ে।”

বলতে বলতে সুজনের কণ্ঠস্বরে কারুণ্য এলো। “আমার সাধ্যের সীমা কতদূর তার একটা আভাস পেয়েছি। সাধ্যের অতিরিক্ত করতে গেলে সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয় না, শুধু জীবন বৃথা যায়। তার চেয়ে পরাজয় বরণ করা শ্রেয়। আমি পরাজিত, একথা বলতে একদিন আমার আত্মাভিমানে বাধত। এখনো বাধছে। কিন্তু এমন দিন আসবে যেদিন আমি অসঙ্কোচে হার মানব।”

“যেমন আমি মেনেছি হার!” তন্ময় ক্ষীণ স্বরে বলল।

এবার কান্তির পালা। একটু আগে যে হৈ চৈ করছিল, খৈ ফুটছিল যার মুখে, সে একেবারে চুপ। নিথর নিঃস্পন্দ হয়ে বসেছিল ধ্যানীবুদ্ধের মতো। জাহাজ ধরতে হবে, তার জন্যে তাড়া নেই। বলবে না মনে করেছিল; কিন্তু না বলে উপায় নেই। কী বলবে? কতটুকু বলবে?

“অনুত্তম, সুজন, তন্ময়,” ধীরে ধীরে বলতে লাগল কান্তি, “তোদের অন্বেষণ আর আমার অন্বেষণ এক জাতের নয়। আমার কান্তিমতী সবঠাঁই রয়েছে। তাকে খুঁজে পাবার জন্যে কোথাও যেতে হবে না। তাই পৌঁছনোর প্রশ্ন ওঠে না। আমি গোড়া থেকেই পৌঁছে রয়েছি।”

“তা হলে,” কান্তিই আবার বলল, “কিসের অন্বেষণে আমি ঘুরছি? কবে সাঙ্গ হবে অন্বেষণ? আমিও নিজেকে এসব কথা জিজ্ঞাসা করি। উত্তর পাই, কোথাও বাঁধা থাকব না, কারো সঙ্গে নীড় বাঁধব না, আকাশে আকাশে পাশাপাশি উড়ব। কিন্তু আরেকজন রাজী হলে তো! সে যদি বলে, আকাশে আকাশে পাশাপাশি নয়, বাঁধা নীড়ে পাশাপাশি, তাও এক বসন্তে নয়, প্রতি বসন্তে, সারাজীবনের সব ক'টা ঋতুতে! সে যদি বলে, সংসারী হও, সন্তানের ভার নাও, সমাজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে শান্তিতে থাক, তার পরে যদি সুযোগ

হয় তবেই সৃষ্টি করবে, নয় তো নয়!"

বন্ধুরা সমব্যথী। কেউ কোনো মন্তব্য করে না। তখন কান্তি শুধু এইটুকু বলে শেষ করে দেয়, "আমি অপরাজিত। অপরাজিতই থাকব।"

ঘরের আবহাওয়া আবার জমাট হয়ে আসছে দেখে তন্ময় হেসে বলল, "যদি না মেলে অপরাজিতা।" বলে সুজনের সঙ্গে চোখা-চোখি করল। কিন্তু সুজনের চোখে হাসি কোথায়! সে যেন আসন্ন পরাজয়ের অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনায় Stoic-এর মতো কঠোর। এ কোন নতুন সুজন!

অনুত্তম উঠে বলল, "আমাকে মাফ করিস্, ভাই কান্তি। তোকে জাহাজে তুলে দিয়ে আসতে চেষ্টা করব। কিন্তু আপাতত বিদায় নিতে বাধ্য হচ্ছি। রাজনীতি অতি নিষ্ঠুরা স্বামিনী। গিয়ে হয়তো শুনব আমারই দোষে মিটমাটের সুতো ছিঁড়ে গেছে।"

তন্ময় ও রূপমতী

বিয়ের দিনটা নিছক আনন্দের দিন। তন্ময় কিন্তু সেদিন অবিমিশ্র আনন্দ বোধ করেনি। বাসর রাত্রি জেগে কাটিয়েছে অপলক দৃষ্টিতে। তার বধূর দিকে চেয়ে। তার ঘুমন্ত রাজকন্যার দিকে। যে রাজকন্যা তার ঘরে, তার শয্যায়, তার বাহু উপাধানে, তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিঃশ্বাস মিশিয়ে প্রথম আত্মসমর্পণের পর পরম নির্ভরতার সঙ্গে প্রসুপ্ত।

পরিপূর্ণ সৌন্দর্য। রমণীয় রূপ। বিকশিত যৌবন। সদ্য প্রস্ফুটিত সুগন্ধ। তনুসুরভি। এ কি কখনো স্থির থাকতে পারে এক রজনীর বাহু বন্ধনে! এ চলবে। এর পিছন পিছন চলতে হবে তন্ময়কেও। অনুসরণই অন্বেষণ। অন্বেষণে ক্লান্তি এলে ক্ষান্তি দিলে রূপমতী চলে যাবে দৃষ্টির আড়ালে। দাঁড়াবে না, পায়চারি করবে না, ফিরে আসবে না। তা হলে আমার সুখ!—তন্ময় ভাবে।

সুখের জন্যে বিয়ে করতে হলে করতে হয় তাকে যে থাকতে এসেছে। যে স্থির থাকবে। কিন্তু সে তো রূপমতী নয়। তার সঙ্গে ঘর করে সুখী হওয়া যায়, কিন্তু এর সঙ্গে নিঃশ্বাস নিয়ে স্বর্গ ছুঁয়ে আসা যায়। ধন্য হয়েছি আমি, ধন্য একে পেয়ে।—তন্ময় ভাবে। কিন্তু কতক্ষণের জন্যে! এখন থেকে মিনিট গুনতে, ঘণ্টা গুনতে, দিন গুনতে হবে। গুনতে হবে সপ্তাহ আর মাস। বছর পুরবে কি না কে বলতে পারে! হাঁ, বছর পুরবে, বছরের পর বছর পুরবে, তন্ময় যদি ক্লান্ত না হয়। ক্ষান্ত না হয়। হাঁ, আয়ুষ্কালও পুরবে তন্ময় যদি জীবনভর অনুসরণ করে, অন্বেষণ করে।

কিন্তু সুখ! সুখ কই তাতে? সেই অন্তহীন অনুসরণে?

মন চায় স্থিতি। পরমা নিশ্চিতি। দেহ চায় বিশ্রাম। সবিশ্রাম সম্ভোগ। অনুসরণের জন্যে প্রতিনিয়ত প্রস্তুত কে? আত্মা? আত্মারও কি শান্তির আকিঞ্চন নেই? সেও কি এক দিন বিনতি করবে না, রূপমতী, দৃষ্টির আড়ালে চলে যেয়ো না, দাঁড়াও? রাজা সংবরণের মতো সূর্যকন্যাকে বলবে না, তপতি, আমি যে আর ছুটতে পারছিনে, থামো?

রাজ, প্রিয় রাজ, তুমি যদি দয়া করে ধরা না দাও আমার সাধ্য কী যে আমি তোমায় ধরি! এই যে তুমি ধরা দিয়েছ এ কি আমার সাধনায়! এ তোমার করুণায়। আমার সুখ আমার হাতে নয়। তোমার হাতে।—তন্ময় ভাবে। এক চোখে আনন্দ এক চোখে বিষাদ নিয়ে দু'চোখ ভরে দেখে। আহা, এই রাতটি যদি অশেষ হতো, যদি কোনো মায়াবীর মায়াদণ্ডের ছোঁওয়া লেগে অ-পোহান হতো, যদি হাজার বছর কোথা দিয়ে কেটে যেত কেউ হিসাব না রাখত, তা হলে রূপ আর সুখ এক অপরকে ঘরছাড়া করত না, এক সঙ্গে বাস করত অনন্ত কাল। এক বৃন্তে ফুটে থাকত রূপমতী নারী আর সুখীতম পুরুষ। কোনো দিন ঝরে পড়ত না।

রূপমতী নারী। চিরন্তনী নারী। এই নারীতে আছে সেই নারী। এ যদি একটি রাতও থাকে, তার পরে না থাকে, তা হলেও চিরন্তনের চিহ্ন রেখে যাবে তন্ময়ের জীবনে। পরশ পাথরের পরশ লেগে সোনা হয়ে যাবে তার অঙ্গ। সোনা হয়ে যাবে তার মন। তন্ময়ের এক রাত্রের অভিজ্ঞতা সারা জীবনের রূপান্তর ঘটাবে। পরবর্তী জীবন অন্যরূপ হবে। তাতে সুখ থাকবে না তা ঠিক, রূপমতী কোলে না থাকলে সুখ কোথায়, নিত্য অনুসরণে সুখ থাকতে পারে না। তবু সে ধন্য, সে সার্থক, সে অসাধারণ ও অসামান্য। তন্ময় তার বিয়ের রাতটিকে তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করে। এক জীবনে এমন রাত্রি দু'বার আসে না। কাল বেঁচে থাকবে

কি না তাই বা কেমন করে জানবে!

বাসরের পরে মধুমাস। মধুমাস যেন ফুরোতে চায় না। দু'জনে দু'জনের মুখে মুখ রেখে ঘুমিয়ে পড়ে কখন একসময়। উঠে দেখে বেলা হয়ে গেছে। মুখোমুখি বসে কফি খায়। তার পর যে যার সাজ পোশাক পরতে যায়। দিনের বেলা তাদের ছাড়াছাড়ির পরে আবার মিলজুল হয়। প্রথম আবিষ্কারের পুলক নিয়ে তারা পরস্পরের দিকে তাকায়।

"তন্ময়। তন্ময়। কোথায় তুমি? এসো আমার কাছে।"

"রাজ। রাজ। এই যে তুমি। কত কাল পরে তোমায় দেখছি।"

"কেন? কত কাল কেন? এখনো তো একঘণ্টা হয়নি।"

"তোমার ঘড়িতে এক ঘণ্টা। আমার ঘড়িতে এক হাজার ঘণ্টা।"

"ও ডারলিং!"

"ও ডিয়ার!"

মধুমাসটা ফ্রান্সে কাটিয়ে ওরা ইংলণ্ড যায়। চাকরির চেষ্টায় একটু বেশি ছাড়াছাড়ি হয়, একটু কম মিলজুল। তাতে রাতগুলি আরো মধুর হয়। ঘুম পথ ছেড়ে দেয় চুম-কে। কাজ জুটল। ফিরল ওরা স্বদেশে। ঘর বাঁধল পুনায়। সংসার শুরু হলো। মধু, মধু, সব মধু। ধোপার খাতা, গয়লার হিসাব, দরজীর মাপ, তাসখেলার দেনা—মধু, মধু, সব মধু।

প্রথম বছরটা ওরা এমনি করে কাটিয়ে দেয় নিজেদের নিয়ে। মাটিতে পা পড়ে না। তন্ময় এমনিতেই বেশ সুপুরুষ। রাজের সঙ্গে যখন সে বেরোয় তখন তাকে আরো সুদর্শন দেখায়। টেনিস খেলতে যখন সে নামে তখন ভীড় দাঁড়িয়ে যায় তাকে দেখতে। তার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে এগিয়ে আসেন রাজারাজড়া সাহেবসুবো, হাত বাড়িয়ে দেন তাঁদের মহিলারা। আর রাজ তো সমাজের আলো। পার্টির প্রাণ। সে না থাকলে উৎসবের উৎসাহ নিবে যায়। ক্লাবে,

মেসে, লাট-ভবনে, রেসকোর্সে রাজ একটি অনুপম আকর্ষণ।

তার পরে কবে কেমন করে মনোমালিন্য সঞ্চার হলো। পূর্ণিমার আকাশে ছোট এক টুকরো কালো মেঘ। রূপমতী তার রূপচর্যা নিয়ে থাকে, রূপচর্যার পরের অধ্যায় সামাজিকতা। সংসারের প্রতি নজর নেই। স্বামীর প্রতি নজর থাকলেও সেটা তেমন আন্তরিক নয়। সেটা যেন একটা কর্তব্য করে যাওয়া। তন্ময় বুঝতে পারে পার্থক্য। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে আর ভাবে, বিশ্বের হাত থেকে ওকে ছিনিয়ে রাখতে পারব সে ক্ষমতা কি আমার আছে! বল কষাকষি করতে গেলে দেখব আমি অবল।

তন্ময়ের অধিকার একে একে খর্ব হলো। যখন তখন গায়ে হাত দিতে পারবে না। বুকে হাত দেওয়া একেবারে বারণ। দু'জনের দুটো আলাদা বিছানা। এক বিছানা থেকে আরেক বিছানায় যেতে অনুমতি লাগে। রূপমতী সকাল সকাল শুতে যায়, যদি না কোনো নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ থাকে। ঘুমের মাঝখানে তাকে বিরক্ত করা চলবে না। তার নিদ্রা নিয়মিত, তার আহার পরিমিত, তার ব্যায়াম দৈনন্দিন, তার স্নান ও প্রসাধন অন্তহীন। তার গড়ন, তার ডৌল, তার সুমিতি, তার সৌষ্ঠব তার কাছে জীবন মরণের প্রশ্ন। তন্ময়ের যেমন চাকরি বজায় রাখা রূপমতীর তেমনি রূপলাবণ্য অটুট রাখা। সতীর সম্বল যেমন সতীত্ব, গায়িকার সম্বল যেমন গীতসিদ্ধি, রূপসীর সম্বল তেমনি রূপ। লবণ যেমন লবণত্ব হারালে কোনো কাজে লাগে না লাবণ্যবতী তেমনি লাবণ্য হারালে কারো কাছে আদর পায় না। সমাজের কাছে তো নয়ই, স্বামীর কাছেও না। তখন তার দর ভূষিমাল হিসাবে। গিন্নীবান্নী বলে। তখন ধারে কাটে না, ভারে কাটে।

তারপর তন্ময় বুঝতে পারল রাজ কোনো দিন মা হবে না। মা হলে তার ফিগার খারাপ হয়ে যাবে। তা হলে সে আর রূপমতী

থাকবে না। তন্ময় কি তখন তাকে পুছবে! পুরুষের ভালোবাসা রূপটুকুর জন্যে। রূপটুকু গেল তো ভ্রমর উড়ল। কথাটা স্পষ্ট করে খুলে না বললেও রাজ যা বলে তার ও ছাড়া আর কোনো অর্থ হয় না। তন্ময় অবশ্য অকালে বাপ হবার জন্যে লালায়িত নয়, কিন্তু কস্মিন্ কালে হবে না এ তো বড় বিষম কথা। অপত্যকামনা কোন পুরুষের নেই! কোন নারীর!

এমনি করে তাদের দু'জনের মধ্যে মনোমালিন্যের সূচনা হলো; কিন্তু তন্ময় এ নিয়ে একটি কথাও বলল না। সংসারে নজর নেই তো কী হয়েছে! এতগুলো চাকর 'রয়েছে কী করতে! তারাই চালিয়ে নেবে। স্বামীর প্রতি নজর আন্তরিক নয় তো কী হয়েছে! স্বামী কি নিজের দেখাশোনা নিজে করতে পারে না! আর সন্তান যদি না হয় তা হলেই বা কী এমন দুর্ভাগ্য! এই তো অমুক অমুক নিঃসন্তান। রোজ ওদের সঙ্গে দেখা হয়। কই, দেখে তো মনে হয় না খুব অসুখী। সন্তান হয়ে, মশাই, অনেক ঝামেলা। বাঁচিয়ে রাখো রে, মানুষ করো রে, সম্পত্তি দিয়ে যাও রে। কোথায় এত তালুক বা মুলুক! রোজগারের টাকা তো মাসকাবারের আগে হাওয়া হয়ে যায়। ও ভালোই হয়েছে। ছেলে হয়নি বা হবে না। তবু যদি হতো!

হায় রে সুখের আশা! স্বামী স্ত্রী সন্তান নিয়ে একটি সম্পূর্ণ পরিবার। অল্পে সন্তুষ্ট একটি স্বাভাবিক জীবন। অথচ রূপমতী নারীর চিরন্তন সঙ্গ। চিরন্তনী নারীর রূপময় প্রকাশ। দু'দিক রক্ষা হয় কী করে? তন্ময় চায় সুখ এবং রূপ এক বৃন্তে দুই ফুল। শুধু রূপ নিয়ে সে সুখী হবে না। শুধু সুখ নিয়ে থাকতে চাইলে রূপ চলে যাবে। তার সদা শঙ্কা, গঙ্গা যেমন চলে গেল শান্তনুকে ফেলে রাজ তেমনি চলে যাবে তন্ময়কে ছেড়ে, যদি একটি কথা বলে তন্ময়। গঙ্গা তার সন্তানকে নদীর জলে বিসর্জন দিয়েছিল। রাজ

তার সন্তানকে গর্ভে আসতে দিল না।

রূপমতীর সৃষ্টি কারো সুখের জন্যে নয়। তন্ময় বলে একজন মানুষকে সুখ বলে একটা পদার্থ দেবার জন্যে সে পৃথিবীতে আসেনি। সে এসেছে অলোকসামান্য রূপ নিয়ে সর্বমানবের সৌন্দর্য-তৃষা শীতল করতে। তন্ময়ের প্রতি তার অসীম অনুগ্রহ বলে সে তার ঘরনী হয়েছে। থাকুক যত দিন আছে।—ভাবে আর কাঁদে তন্ময়। কাঁদে। হাঁ, পুরুষের মতো পুরুষ বলে যার প্রসিদ্ধি সেই বিখ্যাত খেলোয়াড় মনের দুঃখে চোখের জল ঝরায়। কেউ দেখতে পায় না। ওদিকে তার মাথার চুলে শাদা নিশান ওড়ে।

জীবনদেবতার কাছে এমন কী বেশি প্রার্থনা করেছে তন্ময়? কেন তা হলে তার কপালে সুখ নেই?—সে নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেয়, যাদের তিনি সুখ দিয়েছেন তাদের কেউ কি পেয়েছে উত্তমা নায়িকার সঙ্গ? কেউ কি পেয়েছে রূপমতী নারীর স্পর্শ? তার পর সুখ? সুখ কাকে বলে! এই যে ওরা দুটিতে মিলে একসঙ্গে আছে, দু'জনেই নিঃসন্তান, দুজনেই সংসারবিরাগী, এও কি সুখ নয়? স্বার্থপরের মতো জনক হতে চাও তুমি, আরেক জন যে বন্ধ্যা হলো, তার বেলা? তোমার চিহ্ন থাকবে না, তারও কি থাকবে? আহা, যদি একটি মেয়ে হতো! এমনি রূপবতী।

মোট কথা, কেবলমাত্র রূপ নিয়ে তন্ময় তৃপ্ত নয়। সে চায় সুখ। জীবনমোহন তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, সে তা মনে রেখেছে, তবু তার মন মানে না। এটা সে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করলেও ধরা পড়ে যায় স্ত্রীর কাছে। রাজ জানে সবই, বোঝে তন্ময় কী পেলে তৃপ্ত হয়। কিন্তু তারও তো স্বধর্ম আছে। সৌন্দর্যের কাছে সুন্দরী নারীর দায়িত্ব কি প্রতিভার কাছে প্রতিভাবানের দায়িত্বের মতো নয়? সেই সর্বগ্রাসী দায়িত্বের খর্পর থেকে যেটুকু ব্যক্তিগত সুখ উদ্ধার করা যায় সেটুকু কি সে তন্ময়ের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করছে না?

সে কি নিজের জন্যে অতিরিক্ত সুখ দাবী করছে? জগতে রূপের চেয়ে চপল আর কী আছে? যা প্রতি মুহূর্তে পালিয়ে যাচ্ছে তাকে প্রতি মুহূর্তে ধরে রাখা কি সব চেয়ে কঠিন নয়? রূপের সাধনায় লেশমাত্র অবহেলা সয় না, পরে হাজার মাথা খুঁড়লেও হারানো রূপ ফিরে আসবে না। রাজ এই নিয়ে বিব্রত ও বিমনা। তন্ময় যেন তাকে ভুল বুঝে দুঃখ না পায়, দুঃখের ভাগী না করে। সন্তান! সন্তান কি সকলের হয়? আর কারো সঙ্গে বিয়ে হয়ে থাকলে কি সন্তান নিশ্চিত হতো? অতটা নিশ্চিত যদি তো করো আর কাউকে বিয়ে, ছেড়ে দাও আমাকে।—রাজ বলে আভাসে ইঙ্গিতে। টুকরো কথায়।

তবু তো তারা একসঙ্গে ছিল। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল রাজের মন পুনায় টিকছে না। সুযোগ পেলেই সে বম্বে বেড়াতে যায়, রাত কাটিয়ে ফেরে বান্ধবীদের বাড়ীতে। বলে, "তোমাকে একা ফেলে যেতে কি আমার মন চায়? কিন্তু আমি জানি তোমার যা কাজ তার থেকে তোমাকে টেনে বার করা যায় না। তা বলে কি আমি একটু তাজা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে পারব না? এই পচা হাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে মারা যাব?"

তন্ময় একটা বদলির দরখাস্ত করে দিল। তাতে কোনো ফল হলো না। তার পরে করল লম্বা ছুটির দরখাস্ত। স্ত্রীকে নিয়ে ইউরোপে যাবার জন্যে। লম্বা ছুটি মঞ্জুর হলো না। কদাচ এক আধ দিন খুচরো ছুটি মেলে। তখন বম্বে যায় দু'জনে। কিংবা তন্ময় থাকে পুনায়, রাজ যায় বম্বে। গৃহিণী অনুপস্থিত থাকলে গৃহ বলে একটা কিছু থাকে যদিও, তবু তাকে গৃহ বলা চলে না। কারই বা ভালো লাগে তেমন গৃহে একা দিনপাত করতে! দিন যদি বা কাটে রাত কাটতে চায় না। একা শোওয়ার অভ্যাস তার বহু দিন থেকে। সে জন্যে নয়। কিন্তু কাছাকাছি আর একজন যে নেই—যে

উত্তমা নায়িকা, যার অস্তিত্ব তাকে পরমা তৃপ্তি দেয়, যেমন দেয় তার খোঁপার ফুলের গন্ধ। নেই, নেই, সব শূন্য।

যে থাকবে না তাকে ধরে রাখবে কোন মন্ত্রবলে? বিয়ের মন্ত্রে? বেঁধে রাখবে কোন বন্ধনে? সংসার বন্ধনে? অসহায় তন্ময়! এমন কাউকে জানে না যার কাছে বুদ্ধি ধার করতে পারে। জীবনমোহন যদি থাকতেন। কিন্তু বহু দিন তাঁর কোনো খোঁজ খবর নেই। অনুত্তম, সুজন, কান্তি যে যার নিজের ধান্দা নিয়ে কে কোথায় আছে। কারো সঙ্গে কারো যোগাযোগ নেই। একজনের সমস্যা আরেক জনের দুর্বোধ্য। তন্ময়ের সমস্যা তো এই যে সে তার রূপমতীর অনুসরণে বম্বে যেতে পারছে না। যেতে হলে চাকরিতে ইস্তফা দিতে হয়। তার পরে সংসার চলবে কী উপায়ে?

বম্বের বড়লোকদের তন্ময় বলত বোম্বেটে। বোম্বেটেরা তার বৌকে লুট করে নেবে, এ আশঙ্কা তার অবচেতনায় ছিল। লুট অবশ্য গায়ের জোরে নয়। দৌলতের জোরে, দহরম মহরমের জোরে। কোনো দিন কিন্তু কল্পনা করেনি যে রাজ অভিনয় করতে জানে। একটা শখের অভিনয়ে তাকে নামতে দেখে দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে যায়। শহরময় ছড়িয়ে পড়ে তার নাম। সে নিজে অতটা প্রত্যাশা করেনি। তার বান্ধবীরাও করেনি। আর একটা শখের অভিনয়ের মহড়া চলেছে এমন সময় এক হিন্দী ফিল্ম কোম্পানী থেকে প্রস্তাব এলো রাজ যদি নায়িকা সাজে তা হলে কোম্পানী তার সঙ্গে চুক্তি করতে রাজী। হোটেলের সুইট তারাই জোগাবে। বিল তারাই মেটাবে। তাদের মোটর থাকবে চব্বিশ ঘণ্টা মোতায়েন। এ ছাড়া মাসে দু'হাজার টাকা হাত খরচা।

তন্ময়ের অনুমতি না নিয়ে রাজ চুক্তি করতে নারাজ। তন্ময় বলল, "তুমি যা ভালো মনে করবে তা করবে। আমি কি কোনো দিন কিছু বলেছি যে আজ বলব?"

"না, না, তুমি বলবে বই-কি। তুমি যদি বারণ কর আমি যাব না।"

"আমি যদি বারণ না করি?" তন্ময় বলল চোখে চোখ রেখে।

রাজ চোখ নামিয়ে বলল, "থাক।"

তন্ময় বুঝতে পেরেছিল রাজ ক্রমেই তার দৃষ্টির আড়ালে চলে যাচ্ছে। তাকে দাঁড়াতে বললে সে দাঁড়াবে না, থামতে বললে সে থামবে না, ফিরতে বললে সে ফিরবে না। একমাত্র পন্থা তার পিছু পিছু যাওয়া, তাকে সব প্রলোভন থেকে রক্ষা করা, সব সম্মোহন থেকে উদ্ধার করা। কিন্তু তা হলে চাকরি ছেড়ে দিতে হয়। তার পরে কী করে চালাবে? স্ত্রীর হোটেলের সুইটে স্ত্রীর পোষ্য হয়ে কাটাবে? না স্ত্রীর সুপারিশে কোম্পানীর পোষ্য? কিছু দিন পরে যখন চুক্তির মেয়াদ ফুরোবে তখন কি রাস্তায় দাঁড়াবে?

অনুসরণ করতে হলে যতটা ঝুঁকি নিতে হয় ততটা ঝুঁকি নিতে বিয়ের আগে সে তৈরি ছিল, বিয়ের পরে তৈরি নয় দেখা গেল। এখন সে একজন মান্যগণ্য ভদ্রলোক, দস্তুরমতো পদস্থ সরকারী কর্মচারী। টেনিসের কল্যাণে স্বয়ং লাটসাহেবের প্রিয়পাত্র। মাঝে মাঝে তার ডাক পড়ে লাটসাহেবের সঙ্গে খেলতে। যখন তিনি পুনায় থাকেন। পুরুষ তার পৌরুষ বিসর্জন দিয়ে স্ত্রীর অনুগত হয়ে জীবনপাত করবে? রূপমতী রাজকন্যার এই কি শর্ত? তার কাঁদতে ইচ্ছা করে। সে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদেও। দেখতে ইয়া জোয়ান। আসলে একটি অসহায় শিশু।

মাথার উপর শাদা নিশান উড়ল। তন্ময় তার স্ত্রীর সম্মানে মস্ত একটা পার্টি দিয়ে নিজের পরাভব উৎসবময় করল। অভিভূত দয়িতাকে বলল, "রাজ, রাজার মতো জয়যাত্রায় যাও।"

রাজ বুঝতে পেরেছিল এটা তার বিদায় সম্বর্ধনা। তন্ময়ের কষ্ট দেখে তার কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু যে শক্তি তাকে সামনের দিকে টেনে

নিয়ে যাচ্ছিল সে শক্তির তুলনায় পিছুটান কিছু নয়! বলল, “তোমার অনেক কাজ। নইলে তোমাকে আমি এখানে একা থাকতে দিতুম না, প্রিয়তম। আমার মন পড়ে থাকবে তোমার কাছে। আসব আমি যখনি ছাড়া পাব। লণ্ডন নয়, প্যারিস নয়, যাচ্ছি তো বম্বে। তিন ঘণ্টার যাত্রা। এটা কি একটা যাওয়া যে তুমি মন খারাপ করবে!”

রাজ সেদিন খোশ মেজাজে ছিল। তন্ময়ের কোলে আপনি এসে ধরা দিল। বলল, “এ ধন তো তোমার রইলই। এ কোনো দিন চুরি যাবে না। আমি তোমার হয়ে পাহারা দেব। ভেবো না।” এই বলে তাকে সে রাত্রে আশাতীত সুখ দিল।

এটা কি একটা যাওয়া যে এই নিয়ে তন্ময় মন খারাপ করবে? বলতে পারল না বেচারা যে পুনা থেকে বম্বে হলে মন খারাপ করত না, কিন্তু এ যে ঘরসংসার থেকে রঙ্গমঞ্চে, সমাজ থেকে অসমাজে। ক্রমে ক্রমে দৃষ্টির পরপারে। এ একপ্রকার মৃত্যু। যদিও বলতে নেই।

যাত্রাকালে একান্ত নম্র নত বিনীত ভাবে সে তার পত্নীর করচুম্বন করল। বলল, “পাছে তুমি চলে যাও সেই ভয়ে কোনো দিন তোমাকে কোনো কথা বলিনি। এখন তো তুমি আপনা হতে চললে। এখন আমার অন্তরে শুধু একটি কথা ঘুরে ফিরে আসছে।”

“সে কথাটি কী কথা?”

“সে কথাটি—” বলবে কি বলবে না করে অবশেষে বলেই ফেলল তন্ময়, “সে কথাটি এই কথা যে আমি তোমার কাছে কোনো অপরাধ করিনি। কেন তবে তুমি আমাকে ছেড়ে চললে?” বলতে বলতে তন্ময়ের চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ল।

“ওঃ নন্‌সেন্স!” রাজ তার কপালে গায়ে চিবুকে ঠোঁটে চুম্বনের পর চুম্বন এঁকে দিল।

“তোমাকেই যদি ছাড়ব তবে কার জন্যে বাপ মা জাত ধর্ম ছেড়ে

এলুম? তুমি আমারই। আমি তোমারই। কেউ কোনো অপরাধ করেনি। করছে না। করবে না। স্থির হও।"

হিন্দী ফিল্মে নামবার সময় রাজ একটা ছদ্মনাম নিল। বসন্ত-মঞ্জরী। তার আবির্ভাব চিত্রজগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি আনন্দের হিল্লোল তুলল। পুনায় যারা তাকে চিনত তারা এসে অভিনন্দন জানিয়ে গেল তন্ময়কে। নিজের স্ত্রীকে পরের নায়িকা-রূপে অভিনয় করতে দেখা কি সামান্য সৌভাগ্য! দেখতে গিয়ে তন্ময় ঠিক আর সকলের মতো তন্ময় হতে পারল না। মাঝখানে অন্যমনস্ক হলো। নায়ক নায়িকার প্রণয়দৃশ্য যথেষ্ট সংযমের সঙ্গে দেখানো হয়েছিল। তবু এক ঘর লোক এমন ভাবে নিল যেন সব কিছু হতে যাচ্ছে। আর কী বিশ্রী নাগরালি ঐ নায়কটার!

তন্ময় আবার ছুটির দরখাস্ত করল। এবার তার ছুটির হুকুম এলো। সে প্যারিসে যাবার আয়োজন করে রাজকে জানাল। রাজ বলল, "এখন কী করে সম্ভব? ওরা আমাকে ছাড়লে তো? আমি যে একটা চুক্তি সই করেছি।"

চুক্তির খেলাপ করলে কিছু টাকা ঘর থেকে বেরিয়ে যেত। তন্ময় রাজী ছিল ও টাকা দিতে। কিন্তু রাজ বলল, "প্রশ্নটা টাকার নয়। দেশের লোক চায় আমাকে দেখতে। রূপ যদি ভগবান আমাকে দিয়ে থাকেন তবে আমার দেশবাসী তার থেকে বঞ্চিত হবে কেন? লোকে যখন তোমার টেনিস খেলা দেখতে চায় তখন তুমি কি পাহাড়ে চলে যাবার কথা ভাবতে পারো?"

বেচারার ছুটি নেওয়া হলো না। যথাকালে নতুন ফিল্ম দেখতে হলো। সেই নায়কটাই যেন মৌরসী পাট্টা নিয়েছে। যেখানেই বসন্তমঞ্জরী সেখানেই কিষণচন্দর। তন্ময় শুনতে পেলো এটা যে কেবল স্টুডিওতে তাই নয়। হোটেলে রেসকোর্সে ক্লাবে। পার্টিতে। ওদের একসঙ্গে দেখতে দেখতে অপরিচিতরা ধরে নিয়েছে যে ওরা

কেবল অভিনয় করে না। আর পরিচিতরা অবাক হয়ে ভাবছে তন্ময় কেন এতটা সহ্য করছে!

একদিন তন্ময়ের অনুযোগের উত্তরে রাজ বলল, "ও আমার প্রোফেসনাল পার্টনার। তোমার যেমন টেনিস পার্টনার মিস উইলসন। এতে দোষের কী আছে? আমাকে তোমার যদি এতই সন্দেহ তুমিও একটি মিসট্রেস নিলে পারো। আমি কিছু মনে করব না।"

শক্ পেয়ে স্তম্ভিত হলো তন্ময়। অনেকক্ষণ পরে বাক্‌শক্তি ফিরে পেয়ে বলল, "যে উত্তমা নায়িকার স্বাদ পেয়েছে সে কি অপরা নায়িকা আস্বাদন করতে পারে!"

সুজন ও কলাবতী

সুজনের মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে তার পরমায়ু বেশি দিন নয়। যে ক'দিন বাঁচবে সে ক'দিন কলাবতীর অন্বেষণে কাটাবে। অন্বেষণ কিন্তু মিলনের অন্বেষণ নয়। বকুলের সঙ্গে মিলন কোনো দিন হবে না। কলাবতীর অন্বেষণ হচ্ছে কলাবিদ্যার অন্বেষণ, যে বিদ্যা অতি সাধারণ লেখককে অসাধারণ করে। সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তনীর অন্বেষণও বটে, যে নারী তারার মতো সুন্দর, অথচ তারার মতো যার প্রভাব পড়ে জীবনের উপরে।

এর কিন্তু একটি প্রচ্ছন্ন শর্ত আছে। নিষ্ঠা রাখতে হবে কেবল কলাবিদ্যার প্রতি নয়, কলাবতীর প্রতিও। আর কাউকে বিয়ে করা চলবে না, আর কাউকে ভালোবাসা চলবে না। দ্বিচারিতা করলে অন্বেষণে ছেদ পড়বে। তারপর আর ক'টা দিনই বা সুজন বাঁচবে! কীই বা দিয়ে যাবে সাহিত্যে! স্বল্প যার পরমায়ু সে কি অমন করে আয়ুক্ষয় করতে পারে! বাবা যদি বুঝতেন তা হলে কি তার মতো দেশকাতুরে লোক দেশান্তরী হতো! তিনি অবুঝ বলেই না তাকে তার জীবনের পরিকল্পনা বদলাতে হলো। শান্ত শিষ্ট সুস্থির প্রকৃতির মানুষটি ধীরে সুস্থে কোঁচা দুলিয়ে কাছা ঝুলিয়ে ঢিলে-ঢালা জামা পরে থপ থপ করে কলকাতার রাস্তায় হাঁটত। আঁটসাট লাউঞ্জ সুট পরা ত্বরিতগতি করিৎকর্মা এ কোন পুরুষ তালে তালে পা তুলে পা ফেলে লণ্ডনের পথে ঘাটে চলেছে!

স্বপ্নবিলাসী বলে ভাবালু বলে তার বন্ধুরা তাকে খোঁচা দিত। "ওঃ সুজন! ওকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না। একটা টেলিগ্রাম কেমন করে পাঠাতে হয় তা ও জানে না।" এখন তাকে যেই দেখে সেই তারিফ করে জোগাড়ে বলে চটপটে বলে। দেশে থাকতে

মিশনারীদের বাংলা রচনা ঘষামাজা করতে হয়েছিল কয়েক বার। তাঁদের একজন লণ্ডনে তাকে তাঁর ধর্মশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ পরিমার্জনের জন্যে দেন। সে তো কোনো রকম পারিশ্রমিক নেবে না। পাদ্রীসাহেব তাই তাকে চাকরি জুটিয়ে দিলেন সুপারিশ করে। বেতন এমন কিছু নয়, কিন্তু সুবাদ যথেষ্ট। সে বাংলার অধ্যাপক এই সুবাদে ব্যবসায়ী মহল থেকে অর্ডার পায় ইংরেজী বিজ্ঞাপন বাংলায় তর্জমার জন্যে। ওষুধের কৌটায় পথ্যের শিশিতে সুজনের কীর্তি তার দেশবাসীর গোচর হয়।

দু'চার জায়গায় ঘোরাঘুরির পর সুজন রাসেল স্কোয়ার অঞ্চলে গ্যারেট নেয়। রাত্রে শুতে আসে সেখানে। বাকী সময়টা বাইরে বাইরে কাটায়। বাইরেই খায়। খানাপিনায় তার বাছবিচার নেই। গোপালের মতো যা পায় তাই খায়। অথচ কী খুঁৎখুঁতে ছিল দেশে থাকতে! সারা দিন খেটে খুটে রোজ সন্ধ্যাবেলা থিয়েটারে হাজির হওয়া তার চাই। যেদিন থিয়েটারে যায় না সেদিন কনসার্টে যায়। যেদিন কনসার্টে যায় না সেদিন যায় কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির বক্তৃতায়। লণ্ডনে বারো মাস ত্রিশ দিন এত রকম আকর্ষণ যে দেখে ক্লান্তি আসে না। শুনে শ্রান্তি আসে না। নিত্য নূতনের নেশায় মশগুল থাকে সুজন।

কেবল রবিবারটা বাদে। সেদিন সে রাতকাপড়ের উপর ড্রেসিং গাউন চড়িয়ে আগুন পোহাতে পোহাতে দেশের চিঠি কাগজ পড়ে আর দেশের লোকের জন্যে প্রবন্ধ লেখে। তার ঘরে খাবার পৌঁছে দিয়ে যায় বুড়ী ল্যাণ্ডলেডী মিসেস কনোলী। বিকেলের দিকে সুজন তার সেরা পোশাক গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে সামাজিকতা করতে। যার জন্যে সময় পায়নি সপ্তাহের অন্য কোনো দিন। কয়েকটি বিশিষ্ট বাঙালী পরিবারে তার বাঁধা নিমন্ত্রণ। তাঁদের ওখানে গেলে এক ঝাঁক বাঙালী যুবক যুবতীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

মনে হয় বাংলাদেশে ফিরে গেছি বিদেশী বেশবাসে। কথাবার্তা গল্পগুজব সব কিছু বাংলায়। বাংলা গান বাংলা সুর। বাংলা খাবার। বাঙালীর রান্না।

মুখচোরা মানুষ। আলাপ করতে তার লজ্জাবতী লতার মতো সঙ্কোচ। এমন যে সুজন বিদেশে তার হঠাৎ মুখ খুলে যায়। অপরিচিতকে—অপরিচিতাকেও—হাত বাড়িয়ে দিয়ে শুধায়, "এই যে। কেমন আছেন?" সাহিত্যিক বলে তার নাম অনেকে জানত। যারা জানত না তারাও অনুমান করত তার চেহারা ও কথাবার্তা থেকে। থিয়েটার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবর রাখত বলে সহজেই তার চার দিকে ভিড় জমত। যেসব থিয়েটার পাবলিকের জন্যে নয়, যেখানে যেতে হলে মেম্বর হতে হয় বা মেম্বরের অতিথি হতে হয় সেখানেও তার গতিবিধি। কেবল অভিনয়ে নয়, মহড়ায়। সেসব গল্প শুনতে কার না আগ্রহ! কাজেই সুজনের আসাটা আরো অনেকের আসার কারণ ছিল। গৃহকর্ত্রীরা এটা জানতেন। কিন্তু রবিবার ভিন্ন আর কোনো দিন তার সময় হতো না। সেদিন পালা করে সে বিভিন্ন পরিবারে নিমন্ত্রণরক্ষা করত।

যা হয়ে থাকে। তরুণীরা তাকে একটু বেশি রকম পছন্দ করতেন। কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ যেমন সুলভ ছিল অন্তরঙ্গতা ছিল তেমনি দুর্লভ। দুর্লভ না বলে অসম্ভব বললেও চলে। তার জীবনের গল্প সে কাউকে বলত না। প্রশ্ন করলে পাশ কাটাত। নারীসংক্রান্ত কোনো রকম দুর্বলতা কেউ তার আচরণে লক্ষ্য করেনি। সে সকলের সঙ্গে সমানে মেশে, কিন্তু কোনো মেয়ের সঙ্গে বিশেষ করে মেশে না। যদি কেউ তার কাছে বিশেষ পক্ষপাত আশা করে তবে নিরাশ হতে বেশি দিন লাগে না। তার দিক থেকে সৌজন্যের অভাব নেই। সে যে সুজন। তার সৌজন্য ওষ্ঠগত নয়। সহৃদয়। কিন্তু যতই সহৃদয় হোক, ওটা সৌজন্যই। সৌজন্যের অধিক নয়।

ভালোবাসা অন্য জিনিস। তার প্রথম কথা পক্ষপাত। একজনের প্রতি পক্ষপাত।

লণ্ডনের অফুরন্ত কর্মপ্রবাহে দিন কেমন করে সপ্তাহ হয়ে যায়, সপ্তাহ কেমন করে মাস, মাস কেমন করে বছর। সুজন ধ্যানের অবকাশ পায় না। তবু যখনি একটু অবসর পায় বকুলের ধ্যান করে। তার কলাবতীর। তার একমাত্র নারীর। যে নারী বিশ্ব-সৃষ্টির পূর্বেও ছিল, বিশ্বপ্রলয়ের পরেও থাকবে। যে নারীর স্থিতি দেহনিরপেক্ষ। যে নারী গৃহিণী হয়েও গৃহিণী নয়, জননী হয়েও জননী নয়। যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য, বিশুদ্ধ জ্যোতি, তারায় তারায় দীপ্যমান। অন্ধকার যাকে আরো উজ্জ্বল করে ফোটায়। বিরহ যাকে আরো নিকট করে। বিরহের সাধনায় করতে হয় যার অন্বেষণ, মিলনের স্বপ্নে নয়।

সুজন মিলনের স্বপ্ন দেখে না। এ জন্মের মতো যা হবার হয়ে গেছে। ক'টা দিনেরই বা জীবন! দেখতে দেখতে সাঙ্গ হবে। বিরহেই কেটে যাবে দিন। বিরহেই ভরে উঠবে হৃদয়। উপচে পড়বে কবিতা। রচা হবে নব মেঘদূত। নতুন ডিভাইন কমেডি। মানবের মধুরতর গানগুলি মিলন থেকে আসেনি, এসেছে বিরহ থেকে। এই যে সুজন প্রেরণা পাচ্ছে লিখতে, সাত দিনে একদিন যদিও, এ কি মিলন থেকে না বিরহ থেকে? মিলন তাকে মূক করত মাধুর্যে, মূঢ় করত বিস্ময়ে। যার চার দিকে অন্ধকার নেই সেই সূর্যের দিকে তাকালে সে অন্ধ হয়ে যেত আনন্দে। এই সন্ধ্যাতারা তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করছে না, সে অপরের দিকে তাকাতে পারছে, আর দশ জন মেয়ের সঙ্গে মিশতে পারছে, সৌজন্যের পাত্রী পেয়ে সুজন হতে পারছে। এই ভালো, এই ভালো।

দেশে তার লেখার আদর বাড়ছিল। বিদেশে যদিও লেখক বলে কেউ চিনত না তবু গোটা দুই লিটল থিয়েটারের অভিনয়ে

মহড়ায় আড্ডায় হাজিরা দিতে দিতে কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারে সে একজন নাট্যসমালোচক হয়ে উঠেছিল। অভিনেতা অভিনেত্রীরাও তার অভিমত জানতে চাইতেন। তার অভিমতকে যথেষ্ট ওজন দিতেন। জলহাওয়ার গুণে ওদিকে তার ওজনও বাড়ছিল বেশ। দেখে মনে হতো লোকটা কেবল সমজদার নয়, ওজনদারও বটে।

মনের অতলেও তার পরিবর্তন হচ্ছিল। এত গভীরে যে সে নিজে টের পাচ্ছিল কি না সন্দেহ। কলাবতীর প্রতি একনিষ্ঠতা, বকুলের প্রতি একনিষ্ঠতা তার মূলমন্ত্র কিন্তু একনিষ্ঠতা বলতে কাল যা বোঝাত আজও কি তাই বোঝায়? আজ যা বোঝায় কালও কি তাই বোঝাবে? সুজনের একনিষ্ঠতার ব্যাখ্যা বদলে যাচ্ছিল। এই যে এতগুলি মেয়ে এসেছে তার জীবনে এরা দু'দিন পরে এসেছে বলে কি এদের কারো সঙ্গে কোনো রকম সম্বন্ধ পাতানো যায় না? কেবল মেলামেশা পর্যন্ত দৌড়? সে গণ্ডী অতিক্রম করলে একনিষ্ঠতার মর্যাদা থাকে না?

সুজনের সঙ্গে যাদের পরিচয় তাদের মধ্যে তিনজনের সঙ্গে তার মেলামেশা ক্রমে মন জানাজানির পর্যায়ে পেীছল। মন দেওয়া নেওয়া নয় কিন্তু। তার বেলা সুজন অতি সজাগ। ঊর্মিলা তাকে সোজাসুজি সুজন বলে ডাকত। বরাবর ইংলণ্ডে মানুষ হয়েছে। বাঙালীর মেয়েদের মতো দূরত্ব বজায় রেখে চলতে জানে না। সিলভিয়া তাকে আরো ছোট করে জন বলে ডাকে। সেও বলে সিল্‌ভি। ইংরেজের মেয়ে, কিন্তু বাংলাদেশে জন্ম। বেশ বাংলা বলে। অনেকটা বাঙালীর মেয়ের মতো হাবভাব। এরা দু'জনে কুমারী। আর ম্যাদলীন বিবাহিতা। প্রায়ই তাঁর সঙ্গে থিয়েটারে দেখা হতো। ফরাসী মহিলা, বয়সে বড়। ভদ্রতা করে সুজন তাঁকে তাঁর ফ্ল্যাটে পেীছে দিত ফেরবার পথে। তাঁর স্বামী দরজা খুলে দিতেন। তাঁর সঙ্গে এক পেয়ালা কালো কফি না খেলে তিনি

ছাড়তেন না। তাঁর ধনুর্ভঙ্গ পণ তিনি ইংরেজী বুলি বলবেন না, আর কেউ বললে বুঝবেন না। অগত্যা সুজনকে ফরাসী শিখতে হয়।

ঊর্মিলা সিল্‌ভি ম্যাদলীন এদের কাছে তার জীবনকাহিনী অজানা ছিল না। তার কাছে এদের। যে অন্তরঙ্গতা সুজন অন্যের বেলা এড়াতে পেরেছে তা এদের বেলা পারেনি। এইটুকু বিশেষত্ব। এরা তার বন্ধু। যেমন বন্ধু কান্তি তন্ময় অনুত্তম। ছেলেদের সঙ্গে ছেলেদের বন্ধু সম্বন্ধ যেমন, ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের বন্ধু সম্বন্ধ তেমনি। এটা নর-নারী সম্বন্ধ নয়। সুতরাং একনিষ্ঠতার আদর্শে বাধে না। বকুল জানলে কিছু মনে করত না। করলে ভুল করত। সুজন বকুলকে চিঠিপত্র লেখে না, নয়তো নিজেই তাকে জানাত। বকুল ভিন্ন আর কোনো মেয়ের সঙ্গে তার আর কোনো রকম সম্বন্ধ থাকবে না, থাকলে একনিষ্ঠতায় চিড় ধরবে, এটা স্বীকার করে নিতে তার আপত্তি ছিল। বরং তলিয়ে দেখলে এইটেই তার কুমার জীবনকে সহনীয় করেছে। এক দিকে যেমন বকুলের প্রতি আনুগত্য তাকে অক্ষত রেখেছে আর এক দিকে তেমনি ঊর্মিলা সিল্‌ভি ম্যাদলীনের সঙ্গে সৌহার্দ্য তাকে অক্ষত থাকতে সাহায্য করেছে। নইলে তার নিঃসঙ্গ জীবন দুর্বহ হতো। তার অন্বেষণে অবসাদ আসত। ভালোবাসা এ নয়। কারণ এতে মন দেওয়া নেওয়া নেই। সুজন একনিষ্ঠই রয়েছে।

তিন বছর পরে সে ডক্‌টরেট পেলো। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্য-রীতির তুলনা করে সে একটি থীসিস লিখেছিল। সেটি প্রকাশ করতে আরো বছর খানেক লেগে গেল। এর পরে তার দেশে ফেরার কথা। দেশের জন্যে তার মন কেমন করছিল সেই প্রথম বছর থেকে। তার মতো দেশকাতুরে লোক যে এত দিন ধৈর্য ধরতে পেরেছে এই যথেষ্ট। ফিরে যাবার জন্যে প্যাসেজ কিনবে এমন সময় একখানা

চিঠি এলো। লিখেছেন একজন হবু শ্বশুর। চিঠির সঙ্গে একখানি ফোটো ছিল। হবুমতীর। তার সঙ্গে ছিল কয়েক ছত্র উপদেশামৃত। ওটুকু সুজনের পিতার। ব্রহ্মচর্যের পরের ধাপ গার্হস্থ্য। বিবাহ না করে গৃহস্থ হওয়া যায় না। বিবাহকাল সমুপস্থিত। এখন কেবল দেখতে হবে উপযুক্ত সহধর্মিণী কে? আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো আমি উত্তর দেব—হবুমতী। এমন কনে কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।

কাজেই সুজনের দেশে ফেরা হলো না। লণ্ডন ছাড়ল সে ঠিকই। কিন্তু কলকাতার জন্যে নয়। নাটকের নেশা তখন তাকে পেয়ে বসেছে। চলল প্যারিসে। ইতিমধ্যে ফরাসী ভাষাটা তার উত্তম রূপে আয়ত্ত হয়েছিল। চাকরি জুটে গেল এক আমদানি রপ্তানির কারবারে। ইংরেজী থেকে ফরাসীতে, ফরাসী থেকে ইংরেজীতে দলিলপত্র ভাষান্তর করতে হয়। সাধারণ অনুবাদকের চেয়ে আর একটু বেশি দায়িত্বজ্ঞান দরকার। দেশে থাকতে সুজন আইন পড়েছিল। সেটা কাজে লাগল। মাইনে মন্দ দেয় না। Place de la Republique অঞ্চলে হোটেলে থাকা পোষায়। ফরাসী প্রযোজকদের মধ্যে যাঁরা ইংরেজী জানতেন তাঁরা তার মুদ্রিত থীসিস উপহার পেয়ে তাকে ঢালা অনুমতি দিলেন। মঞ্চের আড়ালে তার অবাধ প্রবেশ। তার মন্তব্য শুনতে তাঁদের প্রচুর আগ্রহ।

লঙ্কায় গেলে নাকি রাবণ হয়। তা হলে লণ্ডনে গেলে হয় চটপটে জোগাড়ে ফিটফাট ছিমছাম। আর প্যারিসে গেলে? প্যারিসে গেলে হয় রুচিমান চতুর বাক্‌পটু দিলখোলা। যাই বলো ইংরেজরা এখনো পিউরিটান প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। রঙ্গালয়েও না। ফরাসীদের ও বালাই নেই। খোলাখুলি আবহাওয়ায় সুজন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ভণ্ডামির মুখোশ আঁটতে হলো না। বছরের পর বছর কাটে। দেশে ফেরার নাম করে না। দেশ থেকে অনুরোধ

এলে লিখত, যেখানে দানাপানি সেখানে বীণাপাণি। এখানে যতদিন চাকরি আছে ততদিন শিল্পসৃষ্টিও আছে। দেশে গেলে তো বেকার হতে হবে। কিংবা দরবার করতে হবে যত সব হঠাৎ নবাবের হঠাৎ মোড়লের কাছে। শিল্পসৃষ্টি শিকেয় তোলা থাকবে। আসল কথা বিয়ে করতে তার একটুও স্পৃহা ছিল না। বুড়ো বাপ বেঁচে আছেন শুধু ওইটুকুর জন্যে। কিন্তু কী করে তাঁকে বাধিত করা যায়? একজনকে বিয়ে করবে, আর একজনের প্রতি অনুগত থাকবে, সার্কাসে দড়ির উপর দিয়ে হাঁটার চেয়েও এটা শক্ত। সুজনের বিচারে এটা দ্বিচারিতা, রাধার বিচারে যাই হোক।

এখনো কি সে বকুলের ধ্যান করে? বকুলের মুখখানি মনে পড়ে তার? তেমনি ভালোবাসে? হাঁ, এখনো। বকুলকে আড়াল করেনি আর কারো মুখ। তবু তলে তলে পরিবর্তন চলছিল। একনিষ্ঠতার ব্যাখ্যা লণ্ডনে যেমন ছিল প্যারিসে তেমন ছিল না। মন জানাজানি থেকে মন দেওয়া নেওয়ায় পৌঁছেছিল। দেহ ও মনের মাঝখানে স্পষ্ট একটা বেড়া আছে, সকলের চোখে পড়ে। যেখানে দেহের ব্যাপার সেখানে সুজন সব সময় সতর্ক। কিন্তু বন্ধুর ভালোবাসা ও প্রেমিকের ভালোবাসার মাঝখানে পরিষ্কার কোনো ভেদরেখা নেই। যতই সজাগ থাকো না কেন সীমানার ওপারে গিয়ে পড়া একান্ত স্বাভাবিক ও সহজ। প্যারিসে এসে এই অভিজ্ঞতা হলো। শুরু হয় বধুতা রূপে। বকুলের প্রতি একনিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রেখে। কিন্তু এমন এক সময় এলো যখন সুজন বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করল যে বন্ধুতার রাজ্য পিছনে পড়ে আছে, পায়ের তলায় প্রেমের রাজ্যের মাটি। মেয়েটির নাম সোনিয়া। হোয়াইট রাশিয়ান। অনেক দুঃখ পাওয়া অনেক পোড় খাওয়া বিদগ্ধ কলাবিৎ। বেহালা বাজিয়ে বেড়ায়। লণ্ডনে সুজন তার রিসাইটালে যেত। তখন আলাপ হয়নি। পরে আলাপ হলো প্যারিসে।

সোনিয়ার বিয়ে ভেঙে গেছে। সে আর বিয়ে করবে না। বিয়েকে তার ভয়। সুজনও বিয়ে করতে চায় না। বকুলের প্রতি দ্বিচারিতাকে তার ভয়। একনিষ্ঠতার আদর্শ এই এক জায়গায় অটল ছিল। কিন্তু সুজন যখন ধ্যান করতে বসে বকুলের রূপ ক্রমে সোনিয়ার রূপ হয়ে দাঁড়ায়। বিষণ্ণ বিদগ্ধ অনিকেত অনাথ সোনিয়া। দুনিয়ায় আপন বলতে কেউ তার নেই। ঘর নেই, দেশ নেই, ধন নেই, সঞ্চয় নেই। আছে ঐ বেহালাটি। আর আছে প্রতিভা। যেখানে যখন ডাক পড়ে সেখানে তখন যায়। সুজনকে বলে যায়, আবার দেখা হবে। সুজন বসে থাকে পথ চেয়ে। বিরহ বোধ করে। এ বিরহ বকুলের জন্যে নয়। এ বিরহে মিলনবাসনা মেশানো। মিলন অবশ্য চোখে দেখা, কাছে থাকা, হাতে হাত ধরা, দৈবাৎ ঠোঁটে ঠোঁটে ছোঁয়ানো। .এও কি দ্বিচারিতা? সুজনের মন বলে, না। দ্বিচারিতা নয়। .বরং তলিয়ে দেখলে এরই দ্বারা দ্বিচারিতা নিবারিত হচ্ছে। নয়তো তার কুমারজীবন অসহন হতো। বকুল এর কী বুঝবে! তার তো এ সমস্যা নেই। তবু তাকে বুঝিয়ে বললে সে বুঝত। কিন্তু বোঝাবে কী করে? চিঠি লেখালেখি নেই। শুধু বড়দিনের সময় কার্ড পাঠায়, কার্ড পায়। তাতে দু'এক ছত্র হাতের লেখা জুড়ে দেয় দু'জনেই।

দেহের সঙ্গে মনের সেই যে সুস্পষ্ট ব্যবধান সেটাও ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে এলো। কোথায় দাঁড়ি টানবে? কী করে থামবে! সুজন বুঝতে পারল এবার যা আসছে তা বিয়ে নয়, তবু বিয়ের থেকে অভিন্ন। তার থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পন্থা পালানো। তাকে প্যারিস ত্যাগ করতে হবে। তার মানে সোনিয়াকে ত্যাগ। বেচারি সোনিয়া! তার জীবনটা ত্যাগে ত্যাগে জর্জর। যেই তাকে ভালোবেসেছে সেই তাকে ত্যাগ করেছে। সুজনও এর ব্যতিক্রম নয়। ভাবতে সুজনের ব্যথা লাগে।

হাঁ, আছে বটে আর একটা উপায়। বাসনা কামনাকে বশ করা। ইন্দ্রিয়ের রাশ টেনে ধরা। দেহের প্রতি নির্মম হওয়া। সোনিয়া যখন ঠোঁট বাড়িয়ে দেবে সুজন তখন ঠোঁট বাড়িয়ে দেবে না, সুজন ঠোঁট সরিয়ে নেবে। খেলার ছলে নয়, সত্যি সত্যি। ত্যাগ না করার একমাত্র শর্ত ভোগ না করা। ভোগ করতে গেলেই ত্যাগ করতে হবে। এ বড় নিষ্ঠুর ন্যায়শাস্ত্র। সোনিয়া সব কথা শুনে বলল, "বেশ, তাই হোক। তোমার শর্তে আমি রাজী। তুমি যেয়ো না।" সুজন বেঁচে গেল। তাকে প্যারিস থেকে পালাতে হলো না। সোনিয়াকে ত্যাগ করার গ্লানি বহন করতে হলো না। কিন্তু নিত্য নিত্য সংগ্রাম করতে হলো নিজের বাসনাকামনার সঙ্গে। তার চেহারা বিশ্রী হয়ে গেল। মাথায় টাক পড়ল। ভুঁড়ি ফাঁপতে লাগল। আয়নায় নিজের মূর্তি দেখে সে আঁতকে উঠল। ওদিকে সোনিয়ার তেমন কোনো রূপান্তর ঘটল না কিন্তু।

দীর্ঘকাল ইউরোপে বাস করে সুজনের জীবনের প্রত্যাশা দীর্ঘতর হয়েছিল। বিয়ে যদি তাকে কোনো দিন করতে হয় তবে তত দিনে তার আকার ও আকৃতি হোঁদলকুৎকুতের মতো হয়ে থাকবে বলে তার ভয়। কলাবতীর অন্বেষণ তাকে সুন্দর না করে অসুন্দর করবে এই বা কেমন কথা! চির সৌন্দর্যের ধ্যান থেকে আসবে চরম কুরূপ! কোথায় তা হলে সে ভুল করেছে? সাধনার কোন পদক্ষেপে? প্রকৃতি এ ভাবে প্রতিশোধ নিচ্ছে কেন? সুজন ভাবে আর ভাবে। হঠাৎ তার মনে হয় একনিষ্ঠতাকে সে একটা ফেটিশ করে তুলেছে বলে তার এই দশা। যেখানে প্রেম সর্বদা সক্রিয় সেখানে একনিষ্ঠতা আপনাআপনি আসে। বকুলের প্রতি তার প্রেম অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো এখনো বিদ্যমান, কিন্তু বহতা নদীর সঙ্গে তার তুলনা হয় না। একনিষ্ঠতা এ ক্ষেত্রে নিজেকে বঞ্চিত করা। প্রকৃতি কেন ক্ষমা করবে?

এমন সময় দেশ থেকে চিঠি এলো সুজনের বাবার শক্ত অসুখ। বোধ হয় বেশি দিন বাঁচবেন না। ছেলেকে তিনি দেখতে চান। সোজা বাংলায়—যাবার আগে ছেলের বৌ দেখে যেতে চান। এবার সুজন বেঁকে বসল না। বরং এক প্রকার স্বস্তি বোধ করল। বিয়ে যদি হয় তবে মরণাপন্ন পিতার অন্তিম ইচ্ছায় হোক। তার নিজের ইচ্ছায় নয়। তার নিজের ইচ্ছা যে কী তাই সে জানে না ও বোঝে না। পরমায়ু যদি প্রকৃতই দীর্ঘ হয়ে থাকে তবে বকুলের প্রতি একনিষ্ঠতার খাতিরে সোনিয়ার প্রেম পাওয়া সত্ত্বেও অনবরত তাকে অন্তর্দ্বন্দ্ব চালিয়ে যেতে হবে অবশিষ্ট জীবন। হ্রস্ব পরমায়ু ছিল ভালো। তার যখন কোনো লক্ষণ নেই তখন পরাজয় বরণ না করে উপায় কী! কিন্তু তার আগে এক বার বকুলের সঙ্গে দেখা হলে ভালো হয়। কলম্বো হয়ে দেশে ফিরবে সুজন। যদি দেখে বকুল সুখে আছে তা হলে সে তার বুড়ো বাপকে শেষ ক'টা দিন সুখী করবে। আর যদি লক্ষ্য করে বকুলের মনে সুখ নেই তবে কোন প্রাণে সে নিজের সুখ বা তার পিতার সুখ খুঁজবে! না, তেমন হৃদয়হীন সে নয়। কোনো দিন হবেও না। বকুল যদি অসুখী হয়ে থাকে তবে তার জন্যেই হয়েছে, তারই কথা ভেবে। অসুখীকে আরো অসুখী করবে কে? সুজন? প্রাণ গেলেও না। প্রাণ থাকতে তো নয়ই!

সোনিয়ার কাছ থেকে চোখের জলে বিদায় নিয়ে কলম্বোগামী জাহাজে চড়ে বসল সুজন। সে কাউকে বঞ্চনা করেনি। নিজেকেই বঞ্চিত করেছে। কেউ যেন তার উপর অভিমান পুষে না রাখে। সোনিয়া যেন না ভাবে সুজন তাকে ত্যাগ করেছে। সুখী হোক, সার্থক হোক সোনিয়া। এমন কেউ আসুক তার জীবনে যে তার সাথী হবে অনন্ত কাল। বিদায়, প্রিয়ে! বিদায়, সোনিয়া!

কলম্বোয় মোহিত তাকে নিতে এসেছিল জাহাজ থেকে বাড়ীতে।

বকুল আসতে পারেনি কোলের ছেলে ফেলে। মোহিত তাকে পুরোনো বন্ধুর মতো জড়িয়ে ধরল। বিজয়ী প্রতিযোগীর মতো নয়। বকুল তার জন্যে প্রতীক্ষা করছিল। শুকতারার মতো উজ্জ্বল তার চোখ। প্রজ্ঞাপারমিতার মতো ভাস্বর তার মুখ। মা হয়ে বকুল আরো সুন্দর হয়েছে। যেটুকু বাকী ছিল তার সৌন্দর্যের সেটুকু ভরে গেছে। ভরন্ত গড়ন। রাজরাণীর মতো চলন। এই আট নয় বছরে বকুল বিকশিত হয়েছে শতদলের মতো। আর সুজন? সুজন হয়েছে ক্ষতবিক্ষত বঞ্চিত বিদগ্ধ।

মোহিত আর বকুল দু'জনের অনুরোধে সুজনকে থেকে যেতে হলো সিংহলে দিনের পর দিন, পিতার জন্যে উদ্বেগ নিয়ে। তার ভালো লাগছিল থাকতে। বকুলকে তার জীবনের গল্প শোনাতে। তার ভবিষ্যতের কল্পনা জানাতে।· কোনো কথা সে গোপন করল না, হাতে রাখল না। বকুলের জন্যে সে নিজের সুখ বিসর্জন দেবে যদি নিশ্চিত বুঝতে পারে যে বকুল এ বিবাহে সুখী হয়নি। নয়তো একজন সুখী হবে, আরেক জন অসুখী হবে, একেই কি বলে একনিষ্ঠতা? সুজন আশা করেছিল বকুল তার কাছে মন খুলবে। কোনো কথা গোপন করবে না, লুকিয়ে রাখবে না। তা কি হয়! বকুলের স্বামী আছে, স্বামীর ঘরে বসে কেমন করে স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধের কথা খুলে বলবে সে পরপুরুষকে!

বকুল বলল, "আমি সুখী হয়েছি। এবার তুমি সুখী হলেই আমার আফসোস যায়। বিয়ে কোরো, সুজিদা। ভুলে যেয়ো আমাকে। ফরগেট মি, প্লীজ।"

রওশন তার বোরখা খুলে ফেলেছিল। অন্ধকার রাত। ঘোড়ার গাড়ী। এক রাশ কালো চুল অনুত্তমের গায়ে এসে পড়ছিল। আহা! শিয়ালদা থেকে শ্যামবাজার যদি লক্ষ যোজন দূর হতো, যদি সহস্র বর্ষের পথ হতো।

দু'রাত দু'দিন তাদের চোখে পলক পড়েনি। কেবল কি পুলিশের ভয়ে, গোয়েন্দার ভয়ে? না পুনর্দর্শনের আশা নেই বলে? একজন আরেক জনের গায়ে ঢুলে পড়ছিল। কেবল কি ঘুমের ঘোরে? না বিচ্ছেদ আসন্ন বলে? কেউ কারুর নামটা পর্যন্ত জানে না। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাদের সহযাত্রা শেষ হয়ে যাবে। শেষ যদি হয় তবে হোক না একটু দেরিতে। সেইজন্যে ওরা ট্যাক্সি নেয়নি।

বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে রওশন বলল, "কাল আসবেন?"

অনুত্তম চিত্তচাঞ্চল্য দমন করে বলল, "কখন?"

"দুপুরের দিকে। রওশন বললে কেউ চিনবে না। আমার নাম নয়নিকা।"

"নয়নিকা? কী মধুর নাম!"

"আপনার নাম যদি কেউ জানতে চায় তা হলে কী বলবেন?"

"অনুত্তম।"

"অনুত্তম! মনে রাখবার মতো নাম। মনে রাখবও।"

"আমিও কি ভুলব নাকি? নয়নিকা আমার নয়নে থাকবে। ধ্যাননেত্রে।"

"আবার তা হলে দেখা হবে?"

"নিশ্চয়। নিশ্চয় দেখা হবে।"

ঘোষ লেনের মোড়ে নয়নিকা নেমে গেল। অনুত্তম শুধু ঘোড়ার গাড়ীর দরজাটা খুলে ধরল। হিন্দু পাড়ায় মৌলবীর সাজ পরে নামতে তার সাহস ছিল না অত রাত্রে। বিশেষত নারী নিয়ে। ইচ্ছা থাকলেও নয়নিকা তেমন অনুরোধ করল না। বরং বোরখাটা ফেলে গেল গাড়ীতে।

কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতালায় অনুত্তমের পুরোনো আস্তানা। বন্ধুদের অনেকের জেল হয়ে গেছে। যে দু'এক জন ছিল তাকে আশ্রয় দিল। ওদিকে কিন্তু গাড়োয়ান গিয়ে পুলিশের কানে তুলল যে চট্টগ্রাম মেল থেকে শিয়ালদায় নেমেছেন এক মৌলবী সাহেব ও তাঁর বিবি সাহেবা। বিবি উতরে গেলেন শ্যামবাজারের হিন্দু পাড়ায়, মৌলবী তশরিফ নিয়েছেন কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতালায়।

রাত তখনো পোহায়নি, অনুত্তম সুখস্বপ্ন দেখছে, এমন সময় হানা দিল পুলিশ। বেচারার পরণে তখনো মৌলবীর পোশাক। বদলাবার অবকাশ পায়নি, কোনো মতে চারটি মুখে দিয়ে বিছানা নিয়েছে। হাতে নাতে ধরা পড়ে কবুল করতে বাধ্য হলো যে সে মুসলমান নয়, হিন্দু। নইলে ওরা হয়তো মুসলমানির লক্ষণ মিলিয়ে দেখত।

তার পর কলেজ স্ট্রীট থেকে লালবাজার। লালবাজার থেকে হরিণবাড়ী। হরিণবাড়ী থেকে বহরমপুর। বহরমপুর থেকে রাজশাহী। অদৃষ্ট পুরুষ তাকে নিয়ে পাশা খেলছিলেন। এক একটা দান পড়ে আর ঘুঁটি এগিয়ে চলে দু'ঘর চার ঘর। পৌঁছিয়েও যায়। একটা বড় দান পড়ল, দশ দুই বারো। রাজশাহী থেকে দেউলি। সে দান উলটে গেল। দেউলি থেকে রাজশাহী। এর পরে রাজশাহী থেকে বক্সা। বক্সা থেকে আবার রাজশাহী। অবশেষে অন্তরীন।

অন্তরীন হয়ে তানোর, মান্দা, বদলগাছি, নন্দীগ্রাম, সিংড়া, লালপুর, চারঘাট এমনি সাত ঘাটের জল খেয়ে সে সত্যি সত্যি ছাড়া পেলো। কিন্তু ছাড়া পেলেও ছাড়ন নেই। টিকটিকি সঙ্গ নেয় যখনি যেখানে যায়। তবে বাংলাদেশের বাইরে গেলে রেহাই। সুভাষচন্দ্র তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্ণধার। তিনি রাষ্ট্রপতি হয়ে অনুত্তমকে পাঠালেন বাংলার বাইরে কূটনৈতিক কাজে। ডিপ্লোম্যাট হয়ে লোকটার চেহারা ও চালচলন গেল বদলে।

সাত বছর ধরে সে দুটি নারীর ধ্যান করেছে শয়নে স্বপনে জাগরণে। ভারতমাতা, যাঁর জপমন্ত্র বন্দে মাতরম্। পদ্মাবতী, যার তপোমন্ত্র বন্দে প্রিয়াম্। দু'জনের জন্যেই তার দুর্ভোগ। শুধু একজনের জন্যে নয়। তাই দু'জনের ধ্যানে তার দুর্ভোগ মধুর। হাঁ, আনন্দ আছে মায়ের জন্যে দুঃখ সয়ে, প্রিয়ার জন্যে দুঃখ পেয়ে। আরো তো কত রাজবন্দী সে দেখল। তাদের আনন্দ তার মতো ষোলো আনা নয়। ষোলো কলা নয়। তার আছে নয়নিকা, তাদের কে আছে?

"অনুত্তম? মনে রাখবার মতো নাম। মনে রাখবও।" বলেছিল তার নয়নিকা। একটি মেয়ে তাকে মনে রাখবে বলে কথা দিয়েছে। মনে রেখেছে নিশ্চয়। এইখানে তার জিৎ। তার সাথীদের উপরে জিৎ। তারা নিছক রাজবন্দী। সে রাজপুত্র। রাজকন্যা তাকে মনে রেখেছে। তার সাথীদের দিকে তাকায়, আর অনুকম্পায় ভরে ওঠে তার মন।

ছাড়া পেয়ে তার প্রথম কাজ হলো সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। দ্বিতীয় কাজ নয়নিকার অন্বেষণ। খোঁজ নিয়ে যা শুনল তার চেয়ে শক্তিশেল ছিল ভালো। নয়নিকার বিয়ে হয়ে গেছে। সে যে স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছে তা নয়। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে গিয়ে এত লোককে বিপদ্‌গ্রস্ত করে যে পার্টির কর্তারা প্রাণের দায়ে তার

বিয়ের ফতোয়া দেন। পার্টির আদেশ লঙ্ঘন করলে সাজা আছে। অগত্যা বিয়ে করতে হয়। এক বিলেতফের্তা ডেনটিস্ট তাকে বিনা পণে উদ্ধার করেন। তার গুরুজন তো বর্তে যান। পুলিশের দাপটে তাঁদের স্বস্তি ছিল না।

হায় কন্যা পদ্মাবতী! এই ছিল তোমার মনে! অনুত্তম বুকের ব্যথায় আকুলি বিকুলি করে। আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না! হলে যাকে দেখব সে তো আমার পদ্মাবতী নয়! আমার মতো হতভাগ্য কে! যাদের আমি অনুকম্পা করেছি তারা একে একে বিয়ে করছে, কর্পোরেশনে কাজ পাচ্ছে, আমিই তাদের অনুকম্পার পাত্র। তোমাকেই বা দোষ দিই কী করে! পার্টির আদেশ। গুরুজনের নির্বন্ধ। ক'জন পারে অগ্রাহ্য করতে!

অনুত্তম ভেবে দেখল, সে নিজেও যে বিয়ে করতে চেয়েছিল তা নয়। দেশ যত দিন না স্বাধীনতা পেয়েছে বিয়ে করার স্বাধীনতা তার নেই। তা বলে কি নয়নিকা তত দিন অপেক্ষা করত? বাংলা-দেশের কুমারী মেয়ে বাপ মা'র অমতে ক'দিন একলা থাকবে? কে তাকে পুষবে যদি তাঁরা না পারেন? তাঁরা যদি তত দিন বেঁচে না থাকেন? নয়নিকা যা করেছে ঠিকই করেছে। সে এখন পরস্ত্রী। তার দিকে তাকাবার অধিকার অনুত্তমের আর নেই। এমন কি প্রেরণার জন্যেও না।

এইখানে সুজনের সঙ্গে তার তফাৎ। বম্বেতে সেদিন সুজনের সঙ্গে আবার দেখা হয়। কান্তিকে জাহাজে তুলে দিতে গিয়ে। দুই বন্ধুতে এ নিয়ে বোঝাপড়ার দরকার ছিল। হলো ফেরবার পথে। নয়নিকার বিয়ে হয়ে গেছে জানলে অনুত্তম তার ধ্যান করত না সাত বছর, যা করেছে তা ভুল ধারণা থেকে করেছে। বকুলের বিয়ে হয়ে গেছে জেনেও সুজন তার ধ্যান করেছে দশ বছর। দেশে থাকতে ও দেশের বাইরে। যা করেছে তা ঠিক ধারণা থেকে

করেছে। দু'জনের বোঝাপড়া হলো, কিন্তু বনিবনা হলো না। সুজন কলকাতা চলে গেল, অনন্তম থামল ওয়ার্ধায়।

ও দিকে বল্লভভাইয়ের সঙ্গে বনিবনা হয়নি, গান্ধীর সঙ্গেও হলো না। ব্যর্থ, ব্যর্থ, সব ব্যর্থ। তাঁদের অমতে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হলেন, কিন্তু তাঁদের সহযোগিতা পেলেন না। ইস্তফা দিলেন। তারপরে যেসব কেলেঙ্কারি ঘটল তাতে অনন্তমের মন উঠে গেল দু'পক্ষের উপর থেকে। সে যোগ দিল কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলে। জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে। আর বাংলাদেশে ফিরল না। যুদ্ধের প্রথম দিকে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে, কিন্তু তার পরে দ্বিতীয় পদক্ষেপ নিতে গড়িমসি করে। ইতিমধ্যে জয়প্রকাশ ও অনন্তম দু'জনেরই যুদ্ধবিরোধী ক্রিয়াকলাপ শুরু হয়ে যায়। দু'জনেই গ্রেপ্তার হন।

জেলে তো আরো অনেক বার থেকেছে, কিন্তু এবারকার মতো অসহ্য বোধ হয়নি। এবার নিছক রাজবন্দী। এমন কোনো নারী নেই যে তাকে মনে রাখবে বলে কথা দিয়েছে, মনে রেখেছে। যে তার পদ্মাবতী। সে যার রাজপুত্র। হায় কন্যা পদ্মাবতী! কেমন করে তোমার ধ্যান করব!

ওদিকে কত বড় বড় ঘটনা ঘটছে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে। ধূমকেতুর পুচ্ছ লেগে ফ্রান্স পর্যন্ত টলে পড়েছে। ইংলণ্ড ক'দিন টাল সামলাবে! এর পরে আসছে রাশিয়ার পালা! সোভিয়েটের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বে নাৎসী দানব। সোভিয়েট কি পাল্টা ঝাঁপ দেবে, না পিছু হটতে হটতে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে দানবকে তার গহ্বরে? আমেরিকা কী করবে? আর জাপান?

অনন্তমের ভিতরে যে সৈনিক ছিল সে এক দণ্ড স্থির থাকতে পারছিল না। সে চায় যুদ্ধে যোগ দিতে। যোদ্ধা হতে। অস্ত্র ধরতে। অহিংসায় তার আস্থা ছিল না। ইতিহাসে ভারতবর্ষই

একমাত্র দেশ যেখানে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা চলছে অহিংস রণপদ্ধতির, এ বিশ্বাস তার অন্তর্হিত হয়েছিল। দুনিয়ার আর দশটা দেশের মতো হাতিয়ার হাতে যুদ্ধে নামতে হবে, মারতে হবে, মরতে হবে, এই হচ্ছে পুরুষার্থ। কিন্তু অধীনের মতো নয়। মিত্রের মতো। তা যদি না হয় তবে শত্রুর মতো।

সম্মানের সঙ্গে যা সে করতে পারে তা যুদ্ধে সহযোগিতা নয়, তা বিদ্রোহ, সশস্ত্র বিদ্রোহ। তা করতেই হবে। নইলে সে পুরুষ নয়। কেনই বা কোনো মেয়ে তাকে মনে রাখবে! আজকের বিশ্বরঙ্গমঞ্চে নিষ্ক্রিয় দর্শকের মতো বসে থাকতে তার প্রবল অনিচ্ছা। জীবনটা কি কারাগারে কারাগারেই কেটে যাবে? অসহ্য! অসহ্য! অসম্ভব! খাঁচায় বন্ধ বাঘ যেমন খাঁচাটাকে ভেঙে চুরমার করতে পারলে বাঁচে, ভীষণ আক্রোশে গাঁক গাঁক করে গজরায় আর দারুণ নৈরাশ্যে গুমরায়, অনুত্তম তেমনি তার ইচ্ছাশক্তির ডাইনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে চায় জেলখানার দেয়াল, ক্ষেপে গিয়ে অনর্থ বাধায়, কাতর হয়ে মরার মতো পড়ে থাকে। কত বড় বড় ঘটনা ঘটছে বাইরে। সে কিনা সাক্ষী-গোপাল!

জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনায় ভারতের নেতাদের সঙ্গে একটা মিটমাটের জন্যে ইংলণ্ড থেকে উড়ে এলেন ক্রিপ্‌স্‌। তার আগে নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁদের দলবলকেও। কিন্তু অনুত্তমদের নয়। সে আশা করেছিল ছাড়া পাবে। হতাশ হলো। হতাশা থেকে জাগল মরীয়াভাব। ওয়াপস যান ক্রিপ্‌স্‌। কে চায় আপস! আমরা চাই য়্যাকশন, আমরা চাই বিদ্রোহ। অনুত্তমের মনে হয়, এই হচ্ছে লগ্ন, বিদ্রোহের লগ্ন, বিপ্লবের লগ্ন। এমন লগ্ন ভ্রষ্ট হলে ভারত কোনো দিন স্বাধীন হবে না। এখনি, কিংবা কখনো নয়। বেঁচে থেকে হবে কী যদি এ জন্মে স্বাধীন ভারত দেখে যেতে না পারি!

মন পুড়ছিল। মনের আগুন লেগে দেহ পুড়ল। সিবিল সার্জন

দেখে বললেন, সর্বনাশ! এ যে গ্যালপিং থাইসিস! একে হাসপাতালে সরানো উচিত। হাসপাতালগুলোতে তখন বর্মাফেরতের ভিড়। বেড খালি পেলে তো অনন্তমকে সরাবে। অগত্যা খালাসের হুকুম হলো। অনন্তম যা চেয়েছিল তাই। সে তার এক ডাক্তার বন্ধুর আমন্ত্রণে শোণ নদের ধারে তাঁর প্রতিবেশী হলো। শোণের হাওয়ায়, বন্ধুর যত্নে, বিপ্লবের প্রেরণায় অনন্তমের দেহের আগুন নিবল। কিন্তু মনের আগুন?

ক্রিপ্‌স্‌ ততদিনে ওয়াপস গেছেন। আপস হয়নি। গান্ধীজী কী একটা করতে চান, কিন্তু জাপানী আক্রমণের মুখে ইংরেজের সঙ্গে লড়তে গেলে হিংসাপন্থীরা তার সুযোগ নেবে, তখন ইংরেজ বলবে এরা সকলে জাপানের পঞ্চম বাহিনী, বিশ্বময় বদ্‌নাম রটাবে, কুকুরকে বদ্‌নাম দিয়ে ফাঁসীতে লটকাবে। এই আশঙ্কায় তাঁর সহকর্মীরা ম্রিয়মাণ। তিনি কিন্তু বেপরোয়া। তিনি যদি নিষ্ক্রিয় থাকেন তা হলে কে জানে হয়তো বর্মায় যা ঘটেছে ভারতেও তাই ঘটবে! মালিক বদল। পোড়ামাটি। কুরুক্ষেত্র। এর চেয়ে কিছু একটা করা ভালো। তাতে এমন কী ঝুঁকি! ইচ্ছা করলে বড়লাট তাঁকে বুঝিয়ে নিরস্ত করতে পারেন।

প্রথমে জবাহরলাল তাঁর সঙ্গে একমত হলেন সাতদিন এক সঙ্গে থেকে। তার পরে আর সব নেতা। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গ্রহণ করল। গান্ধীজী লিনলিথগোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবেন, তার আগেই লিনলিথগো তাঁকে বন্দী করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর সবাইকে। সংবাদ পেয়ে অনন্তম মুহূর্তকাল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলো। তার পর বলল, "নিষ্ক্রিয় আমরা থাকব না। জোর করে আমাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখবে এমন শক্তি কার আছে? চলো, একটা কিছু করি। নয়তো মরি।" তার ডাক্তার বন্ধু তার হাত চেপে ধরলেন, সে তাঁর হাত ছাড়িয়ে ছুটে চলল বাইরে।

কোন দিকে যাবে নিজেই জানত না। গেল যে দিকে দু' চোখ যায়। কে জানে কোনখান থেকে পেলো অমানুষিক তেজ। পায়ে হেঁটে পার হলো মাইলের পর মাইল। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই। নেই ব্যথাবোধ। দেখল হাজার হাজার স্ত্রীপুরুষ কাতারে কাতারে চলেছে। তারই মতো অবিকল। যেন বৃষ্টির জলের ঢল নেমেছে। ঢল দেখতে দেখতে স্রোত হলো। স্রোত দেখতে দেখতে নদী হলো। নদী দেখতে দেখতে সমুদ্র হলো। সমুদ্র গর্জে উঠল, "রেল লাইন তোড় দো। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। করেঙ্গে য়া মরেঙ্গে।"

অনুত্তমকে কেউ সে অঞ্চলে চিনত না। কিন্তু বিপ্লবের দিন জনতা যেন রূপকথার রাজহস্তী। কী জানি কী দেখে চিনতে পারে, শুঁড় দিয়ে তুলে নিয়ে পিঠের হাওদায় বসায়। যে দেশে রাজা নেই সে দেশে রাজা চিনতে পারে রাজহস্তী। যে দেশে নেতা নেই সে দেশে নেতা চিনতে পারে জনতা। কখন এক সময় এক পাল লোক এসে অনুত্তমকে কাঁধে তুলে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। চিৎকার করে বলল, "সজ্জনো, বঙ্গাল মুল্ক্ আজাদ বন গিয়া। বোস বাবুনে আপকো ভেজ দিয়া। ছোটা বাবুকী জে!" অনুত্তম তো বিস্ময়ে হতবাক। কাঁধ থেকে মাথায়, মাথা থেকে আসমানে তুলে ওরা তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাচ্ছে। জনতা দেখছে আর হাঁক ছাড়ছে, "ছোটা বাবুকী জে!"

এই সব নয়। কেউ শোর করছে; "ছোটা বাবুকা হুকুম। আগ লগাও।" কেউ গোল করছে, "ছোটা বাবুকী বাত। ডব্বা লুট লেনা।" অনুত্তম তো হতভম্ব। আবার তেমনি নিষ্ক্রিয় সাক্ষী। যা ঘটবার তা ঘটে যাচ্ছে। তার ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা রাখছে না। স্টেশন দাউ দাউ করে জ্বলছে। দুটো একটা মানুষও যে না জ্বলছে তা নয়। নেবাতে যাও দেখি, অমনি ঠেলা খেয়ে জ্বলবে। নেতা বলে

কেউ রেয়াৎ করবে না। মালগাড়ী ভেঙে বস্তা বস্তা চিনি বয়ে নিয়ে পিঁপড়ের সার চলেছে। ঠেকাতে যাও দেখি। অমনি বাড়ি খেয়ে মরবে। নেতা বলে কেউ কেয়ার করবে না।

খন্তা কোদাল শাবল গাঁইতি যার হাতে যা জুটেছে তাই দিয়ে লাইন ওপড়ানো হচ্ছে। স্লীপার পর্যন্ত উঠিয়ে দিচ্ছে। ছোটখাটো পুল একদম সাফ। বড় বড় পুলে বড় বড় ফাঁক। তবে রেল দুর্ঘটনা ঘটছে না। ড্রাইভার টের পেয়ে ইঞ্জিন থামিয়ে পিট্‌টান দিচ্ছে। যাত্রীরা নেমে পড়ছে। জনতা তাদের খেতে দিচ্ছে মালগাড়ি থেকে সরানো আটা ময়দা ঘি দিয়ে তৈরি পুরি কচৌরি। দাক্ষিণ্যের অভাব নেই। কার কী জাত, কার কোন ধর্ম, কেউ জানতে চায় না, কেউ মানতে চায় না। সকলে সকলের স্বজন। দুশমন শুধু সেই যে বিবেকের প্রশ্ন তোলে, যে বাধা দেয়।

কয়েকটা দিন যেন নেশার ঘোরে কেটে গেল। সৈন্য চলাচল বন্ধ। পুলিশের পাত্তা নেই। নবগঠিত গ্রাম পঞ্চায়েৎ গ্রাম শাসন করছে। সরকারী কর্মচারী দেখলে তারা আনুগত্য আদায় করে। নয়তো বন্দী করে। অনুত্তম যেখানেই যায় সেখানেই সম্বর্ধনা পায়। লোকে প্রশ্ন করে, ইংরেজ কি আছে না গেছে? আছে শুনলে জেরা করে, আছে যদি তো ফৌজ পাঠায় না কেন? পুলিশ পাঠায় না কেন? নেই শুনলে বলে, আর ভাবনা কিসের! আজাদী তো মিলে গেছে!

অনুত্তমের তখন একমাত্র ধ্যান বিপ্লবী নায়িকা। হায় কন্যা পদ্মাবতী! তুমি কোথায়? কবে তোমার দেখা পাব এখন যদি না পাই? আর তুমি কী চাও? গুলি চালনা? রক্তপাত? বারুদের গন্ধ? হাহাকার? গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করা? গ্রামনেতাদের গাছে লটকানো? এসব না হলে কি তোমার আবির্ভাবের পূর্বলক্ষণ প্রকট হবে না? হায় কন্যা বীর্যশুল্কা! কে দেবে এই শুল্ক?

অনুত্তম যা আশঙ্কা করেছিল তাই হলো। ফৌজ এসে পড়ল।

রেলপথ মোটরপথ না হয় নেই, কিন্তু আকাশপথ তো আছে। টেলিগ্রাফের তার না হয় নেই। কিন্তু বেতার তো আছে। ইংরেজের মিলিটারি অফিসারদের হুকুমে গ্রামকে গ্রাম মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হলো। মানুষ মরল জাঁতায় পড়ে ইঁদুরের মতো। লোকের মনোবল ভেঙে যাচ্ছে দেখে অনুত্তমের উদ্বেগ একশো পাঁচ ডিগ্রী উঠল। তার মনে হলো এ যাত্রা সে বাঁচবে না, যদি দেশের লোককে বাঁচাতে না পারে।

এমনি এক সন্ধিক্ষণে তার দর্শন পায়। তার পদ্মাবতীর। নীল চশমা চিনতে ভুল করে না।

কাশ্মীরী মেয়ে তারা। কানপুর থেকে এসেছে। তারার মতো জ্বলজ্বল করছে তার চোখ। কিন্তু ধীর স্থির অচঞ্চল তার চাউনি। অনুত্তম অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে শুনে তারা এলো তাকে দেখতে। তার কপালে হাত রেখে শিয়রে বসে থাকল অনেকক্ষণ। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, "অত উদ্বেগ কিসের! যে খেলার যা নিয়ম। আমরা ওদের রাজত্ব ধ্বংস করতে গেছি। আর ওরা আমাদের গ্রাম ধ্বংস করবে না? আমরা ওদের যুদ্ধপ্রচেষ্টা তছনছ করেছি। ওরা আমাদের মুক্তি প্রচেষ্টা তছনছ করবে না? তা সত্ত্বেও আমরা জিতব। ইতিহাস আমাদের পক্ষে।"

ভারতের কোথায় কী ঘটছে অনুত্তম সব কথা জানত না। তারা জানত। একে একে জানাল। সিপাহী বিদ্রোহের পরে এত বড় বিদ্রোহ আর হয়নি। সারা ভারতের উপর দিয়ে যেন একটা সাইক্লোন বয়ে গেছে। ইংরেজ এখনো ছিন্নমূল হয়নি তা সত্য। কিন্তু তার মাজা ভেঙে গেছে। আরেকবার এ রকম একটা বিদ্রোহ ঘটবার আগেই সে সন্ধি করবে। এখন শুধু দেখতে হবে লোকে যাতে এলিয়ে না পড়ে। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে না ফেলে। মহাত্মা যখন অনশন আরম্ভ করবেন তখন যেন আরেক বার ঝড় ডেকে যায়।

তারা যে কোথায় থাকে, কোথায় খায়, কোনখানে কাপড় ছাড়ে কিছুই ঠিক নেই। তার বেশ হরদম বদলায়। বাস হরদম বদলায়। এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে অনবরত ঘোরে, মিলিটারির নজর এড়ায়, অভয় দেয় মেয়েদের, প্রেরণা দেয় পুরুষদের। আর যখনি একটু নিরিবিলি পায় মানচিত্র নিয়ে বসে। তাতে ছোট ছোট পতাকা আঁটা তার একটা কাজ। ফৌজ কোন কোন গ্রামে ঘাঁটি গেড়েছে, কোনখানে তাদের সংখ্যা কত, কোন দিন কোন দিকে তাদের গতি, গতিপথে ক'খানা গ্রাম উজাড় হলো, ক'জন মানুষ সাবাড় হলো, এসব তথ্য তার নখদর্পণে। তার নিজের একটা চর বিভাগ আছে। খবর পায় সে রোজ সময়মতো।

তারাকে দেখলে মনে ভরসা ফিরে আসে। মরণাপন্নও বেঁচে ওঠে। যার দিকে একটিবার সে তাকায় তার অবসাদ কেটে যায়। অনুত্তম শয্যা ছেড়ে কাজে লেগে গেল। যে কোনো দিন মিলটারির গুলিতে তার মরণ। প্রাণ হাতে করে ঘোরাফেরা। তবু নিরুদ্বেগ। কত কাল পরে সে পুনরায় ধ্যান করতে পারল। ধ্যান করল পদ্মাবতীর। বীর্যবতী নারীর। যে নারীর ভয় নেই, ভাবনা নেই, উদ্বেগ নেই, যে নারী সব সময় প্রস্তুত, সবকিছুর জন্যে প্রস্তুত, সব তথ্য যার আঙুলের ডগায়।

মাঝে মাঝে তাদের দু'জনের দুই পথ এক জায়গায় ছক কাটে। কয়েক মিনিটের জন্যে দেখা। অনুত্তমের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তারার চোখে দীপ্তি ফোটে। ওরা যেন এক অপরকে বলতে চায়, এই যে তুমি! ওঃ কতকাল পরে। আবার কবে!

ফেব্রুয়ারি মাস এলো। মহাত্মার অনশন শুরু হলো। এইবার আসছে আর একটা সাইক্লোন। সারা ভারত জুড়ে এর তাণ্ডব। অনুত্তম কান পেতে শোনে, শোঁ শোঁ শোঁ শোঁ। কিন্তু ওটা ওর কল্পনা। বিদ্রোহ করবার মতো সামর্থ্য এত বড় দেশটার কোনোখানেই এক রত্তি ছিল না। একটি একটি করে দিন যায়, মহাত্মার জন্যে

দুর্ভাবনা বাড়তেই থাকে, এক এক সময় মনে হয় তিনি এ যাত্রা বাঁচবেন না, অথচ ইংরেজ রাজত্ব বাঁচবে। তারার সন্ধানে ছুটে যায়, বহু কষ্টে সাক্ষাৎ পায়। সেও তেমনি দিশাহারা। কই, ঝড় তো উঠল না! মহাত্মার অনশন কি ব্যর্থ গেল!

চঞ্চল হয়ে ওঠে তারা। পাগলামিতে পায় তাকে। মহাত্মা মারা যেতে বসেছেন। তবু কেউ কিছু করবে না। সব চুপচাপ নিঃঝুম। ডরে ভয়ে আড়ষ্ট। কিছু একটা করতে বললে ওরা চোরের মতো লুকোয়। গ্রামের মোড়লরা ইতিমধ্যে সরকারের অনুগত প্রজা হয়েছেন। গণপঞ্চায়েৎ বসে না। ডাকলে কেউ আসে না। ঘরে ঘরে গিয়ে তারা ওদের পায়ে ধরে সাধে। করো, করো একটা কিছু মহাত্মার প্রাণরক্ষার জন্যে। ওরা বলে, আমাদের সাধ্য থাকলে তো করব! কেন তিনি অনশন করছেন! না করলেই পারতেন। ইংরেজ প্রবল। সে কি কোনো দিন নড়বে!

বেচারি তারা অনুত্তমের কাছে ছুটে আসে। একটু সহানুভূতির জন্যে। আর কী বলবার আছে অনুত্তমের! অনশন তো ঝড়ের সংকেত হলো না। যা মনে করেছিল তা নয়। এটার অন্য উদ্দেশ্য। এ দিয়ে তিনি পৃথিবীকে জানালেন যে তিনি হিংসার জন্যে দায়ী নন। হিংসা-প্রতিহিংসার ঊর্ধ্বে তাঁর স্থিতি। অনুত্তম স্বীকার করল, সত্যি আমরা তাঁর অহিংসার সুযোগ নিয়েছি। হিংসা থেকে এসেছে প্রতিহিংসা। তার থেকে জনগণের অক্ষমতা।

"এর চেয়ে জেলে যাওয়া ভালো।" তারা বলল কর্তব্য স্থির করে। অনুত্তম বলল, "চলো একসঙ্গে জেলে যাই।" ততদিনে ওরা বেশ একটু ঘনিষ্ঠ হয়েছিল।

কান্তি ও কান্তিমতী

ইন্দ্রসভার নর্তক নর্তকীদেরও নাচতে নাচতে তাল কেটে যায়। ইন্দ্র তাদের শাপ দিয়ে বলেন, "যাও, মানুষ হয়ে জন্মাও।" তখন স্বর্গ হতে বিদায়।

কিন্তু কেন তাল কেটে যায়? কারণ তাদের হৃদয় আছে। ঠিক মানুষের মতো। হৃদয় যদি বশ না থাকে চরণ কী করে বশ মানবে! তখন গন্ধর্বলোক থেকে নরলোকে অবতরণ।

কান্তির জীবনেও এমন দিন এলো যেদিন তার মনে হলো তার নৃত্যের তাল কেটে যাবে। যাবে মীনাক্ষীরও। এক ঘর দর্শকের সম্মুখে অপদস্থ হবে তারা দু'জনে। ধরা পড়বে সমজদারদের চোখে। একালের ইন্দ্ররাজ তেমন কোনো শাপ দেবেন না, তবু শাপভ্রষ্ট হবে তারা অন্য ভাবে। নাটবেদী থেকে অকালে অবসর নেবে। আর নৃত্য করবে না।

মীনাক্ষী যদি অন্যপূর্বা না হতো তা হলেও কান্তি তাকে নিয়ে রাসমঞ্চ থেকে প্রস্থান করত না। কান্তির জীবনের পরিকল্পনায় নিত্য রাস। মীনাক্ষী যদি তার সঙ্গে নৃত্যে যোগ দিতে চায় তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তাল কেটে না যায়। মীনাক্ষীর কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নেই। সে মর্ত্যমুখী। শাপকেই সে বর মনে করে। সে অপ্সরা নয়, মানবী।

সঙ্কটে পড়ল কান্তি। জনান্তিকে বলল, "মীনু, যারা নাচবে তারা ভালোবাসবে না। এই তার অলিখিত শর্ত।"

মীনাক্ষী লজ্জিত হলো। বলল, "যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না?"

"কী জানি! আমার তো আশঙ্কা হয় এক দিন তাল কেটে যাবে। তখন নৃত্য থেকে অপসরণ। কী নিয়ে আমি থাকব তার পরে! বিয়ে

আমার কুষ্ঠিতে লেখেনি। তা ছাড়া বিয়ে করতে চাইলেও দুস্তর বাধা।"

"কিন্তু তাল কেটে যাবেই বা কেন? যদি বা যায় তবে নৃত্য থেকে অপসরণ কেন? আর যে সব কথা বললে তার প্রশ্নই ওঠে না। ভালোবাসলেই বিয়ে করতে হবে এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে? আমি তো ভাবতেই পারিনে।"

কান্তির এত চিন্তা, কিন্তু মীনাক্ষীর একটুও নেই। তার জীবনে যেন বসন্ত এসেছে। দেখতে দেখতে তার তনুমন পল্লবিত মুকুলিত পুষ্পিত প্রস্ফুটিত হচ্ছে। তাল কেটে যাবে বলে তার পরোয়া নেই। ধরা পড়ার ভয়ে হৃৎকম্প নেই। নাটবেদী থেকে অবসর নিলে তার পরে কী নিয়ে থাকবে এ বিষয়ে হুঁশ নেই। তার জীবনের কোনো পরিকল্পনাই নেই। ফুল ফুটলে ঝরে পড়ে। সেও ঝরে পড়বে যখন বসন্ত ফুরোবে।. যখন ভালোবাসা মিটবে।

ও দিকে কান্তির ভিতরে অবিরাম বোঝাপড়া চলছিল। দিনের পর দিন যারা রাধাকৃষ্ণ সেজে নাচবে তাদের দু'জনের সম্বন্ধটা আসলে কী রকম হবে? শুধু মঞ্চের সম্বন্ধ! হৃদয়ের নয়? আত্মার নয়? তারা বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে নিখুঁৎ আঙ্গিকে অভ্রান্ত পদক্ষেপে নাচবে, কিন্তু নাটবেদীর বাইরে বাঁচবে না, ভালোবাসবে না? সেখানে তারা পর? তারা পরকীয়?

নিতান্ত অপরিচিতাকেও যে মাসী পিসী দিদি বলে ডাকে, নেহাৎ নিঃসম্পর্কীয়ার সঙ্গে যে নানা বিচিত্র সম্পর্ক পাতায়, সেই কান্তি যদি বলে যে মীনাক্ষী তার কেউ নয়, ওর সঙ্গে সে কোনো রকম সম্পর্ক পাতায়নি, তা হলে বন্ধুরা পর্যন্ত অবিশ্বাস করবে। কেন? এই একটি মাত্র মেয়ের সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক পাতায়নি কেন? বন্ধুরা শুধাবে।

বন্ধুরা হয়তো বলবে, ভাই বোন সম্পর্ক কী দোষ করল? ভাই

বোন! কান্তি হেসে উড়িয়ে দেবে। না। ভাই বোন সম্পর্ক নয়। রাসনৃত্য ভাই বোনের নয়।

তা হলে স্বামী স্ত্রী? সর্বনাশ! মীনাক্ষীর যে জলজ্যান্ত স্বামী রয়েছে! না থাকলেও কান্তি ছাঁদনাতলায় যেত না। না। রাসলীলা স্বামী স্ত্রীর নয়।

তা হলে সখা সখী? কান্তি চিন্তা করবে। না। রাসরঙ্গ সখা সখীর নয়। তাদের জন্যে হোলি। পার্থক্য আছে।

তা হলে আর কী বাকী থাকে?

ভাবতে ভাবতে কান্তাভাব মনে জাগে। কান্ত আর কান্তা।

কান্তি শিউরে ওঠে। মানুষের মন মানুষ নিজেই জানে না। জানতে পেলে চমকায়। কান্তি বার বার মাথা নাড়ে। না, না, কান্তা-ভাব নয়। আমি যে শ্যামলকে কথা দিয়েছি। আমি কি তাকে ধোঁকা দিতে পারি!

সব চেয়ে ভালো কোনোরূপ সম্পর্ক না পাতানো। ইন্দ্রসভার নর্তক নর্তকীর মতো। ওদের হৃদয়ের বালাই ছিল না। তাই ওদের তালভঙ্গ হতো না। কিন্তু মাঝে মাঝে হতো বই কি। তার থেকে বোঝা যায় ওরাও একেবারে নিঃসম্পর্কীয় ছিল না। হৃদয়হীন ছিল না।

কান্তি ভেবে দেখল নৃত্য করে কে? অঙ্গ, না হৃদয়? হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করার জন্যে বা হৃদয়ের ভার থেকে মুক্ত হবার জন্যে কেউ লেখে কবিতা, কেউ আঁকে ছবি, কেউ গায় গান। ঘটলই বা ছন্দ-পতন। সেটাকে এত ভয় কেন? মোটের উপর একটা কিছু সৃষ্টি হয়ে উঠছে। বিশ্বসৃষ্টির মতো।

তা হলে মীনাক্ষীর সঙ্গে নাচলে ক্ষতি কী? ক্ষতি এই যে অন্যের অলক্ষ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হয়তো নিজের অলক্ষ্যে। কান্ত আর কান্তা। শ্যামল ক্ষমা করবে না। শ্যামল যদি ভদ্রতা

করে সরে যায় তা হলে মীনাক্ষীকে বিয়ে করার বাধ্যবাধকতা জন্মাবে, নইলে মীনাক্ষী ক্ষমা করবে না। একজনের সঙ্গে নাচতে গেলে যদি অবশেষে তাকে বিয়ে করতে হয় তা হলে তার সঙ্গে নাচতে চাইবে কোন মূঢ়! এ কী সঙ্কট, বলো দেখি!

কান্তি স্থির করল মীনাক্ষীর সঙ্গে আর নাচবে না। একই কারণে আর কোনো মেয়ের সঙ্গে নাচবে না। নৃত্য বলতে এখন থেকে একক নৃত্য। কিন্তু সে নিজে চাইলে কী হবে, লোকে চায় না তার একার নাচ। তারা চায় রাধাকৃষ্ণের যুগল নৃত্য। হরপার্বতীর যুগ্ম নৃত্য। নরনারী উভয়ের সংযুক্ত পদক্ষেপ, সুসমঞ্জস পদক্ষেপ।

না, একক নৃত্য জমবে না। কান্তি ভেবে পায় না আর কী সমাধান আছে। আর কী সম্ভবপর! এরূপ স্থলে আগে যা করেছে এবারেও তাই করল। পলায়ন। দৌড়। এক দিন কাউকে কিছু না বলে এক রকম একবস্ত্রে বেরিয়ে পড়ল। যে দিকে দু'চোখ যায়।

স্টুডিও আর স্টেজ নিয়ে তন্ময় ছিল। জীবনের দিকে ফিরে তাকাবার ফাঁক পায়নি। যাদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে তারা দর্শক। তারা যেন মানুষের একজোড়া চোখ, গোটা মানুষটা নয়। জীবনের বহমান স্রোতে ঝাঁপ দিয়ে কান্তি সমগ্রতার স্বাদ পায়।

রসের সায়র। প্রতি দিন তাতে ডুব দিয়ে ওঠে আর নতুন হয়ে যায়। যাই দেখে তাই নতুন লাগে। যাকে দেখে সেই তার চোখে নতুন। পরম বিস্ময় নিয়ে কান্তি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। হাতের কাছে যে কাজ জোটে সে কাজ করে। বাড়ী তৈরী হচ্ছে, রাজমিস্ত্রীর সাগরেদ চাই। আচ্ছা, রাজী। কাঠ চেরাই হচ্ছে, করাতীর সাথী আসেনি, মদৎ চাই। আচ্ছা, রাজী। জাহাজ মেরামত হচ্ছে, রং করছে একদল লোক, কান্তি তাদের ওখানে হাজির।

পথে বিপথে রকমারি মেয়ের সঙ্গে দেখা। কেউ বা কোকেন চালান দেয়, কেউ চোরাই মাল পাচার করে। কেউ পান বেচে, কেউ

জাহাজীদের সঙ্গে নিকা বসে। কেউ পরের ছেলে দেখিয়ে ভিখ মাগে। কেউ রং মেখে সঙ্ সেজে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। এদের কার সঙ্গে কোন সম্পর্ক পাতাবে কান্তি! মানুষের অভিধানে ক'টাই বা শব্দ আছে! মানুষ আছে তার চেয়ে অনেক বেশি।

বিয়ের জন্যে কেউ ঝোলাঝুলি করে না। বিয়ের কথা কেউ মুখে আনে না। বিয়ে একটা সমস্যাই নয়। সমস্যা হচ্ছে আত্মিক সম্বন্ধ। আত্মিক সম্বন্ধ স্থির না হলে কায়িক সম্বন্ধ শুরু হতে পারে না। কিন্তু তার আগেই কান্তি উধাও হয়। কাউকেই ধরা-ছোঁয়া দেয় না। কী জানি কী আছে তার ভিতরে নারীকে যা চুম্বকের মত টানে। কিন্তু ফী বারেই সে আপনাকে ছাড়িয়ে নেয়। সঞ্চারিণীর বন্ধনী এড়ায়।

পূর্বেই তার প্রত্যয় জন্মেছিল একজনের হওয়া মানে আর সবাইকে হারানো। এক দিন একজনের হলে আর সব দিন আর সব জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ। ক্রমে তার প্রত্যয় হলো মুক্ত থাকতে হলে শুদ্ধ থাকতে হয়। কে কতটা মুক্ত সেটা নির্ভর করে কে কতটা শুদ্ধ তার উপর। তা বলে জীবনের ধূলিকাদা থেকে সন্তর্পণে সরে থাকার নাম শুদ্ধি নয়।

এত কাল যত্ন করে সে নৃত্য শিখেছিল। কিন্তু জীবনের সঙ্গে তার যোগ ছিল না। রসের দীক্ষা তার হয়নি। এই বার ঘুরতে ঘুরতে তার রসের দীক্ষা হলো। যার কাছে হলো সে এক রঙ্গিণী নারী। ছইলা গোপিনী।

ছইলা তাকে শেখালো কেমন করে গাই দুইতে হয়, কেমন করে চিড়ে কোটে, মুড়ি ভাজে, কেমন করে ঘুঁটে দেয়, ঘর নিকায়। সারা দিন একটা না একটা কাজে হাত জোড়া থাকে ছইলার। তার সঙ্গে বসে গল্প করতে হলে তার হাতের কাজে হাত লাগাতে হয়। প্রথম প্রথম কান্তির লজ্জা করত। এসব যে মেয়েলি কাজ। কে কী মনে

করবে! বলবে, বা রে পুরুষ! কিন্তু ধীরে ধীরে তার গায়ের চামড়া মোটা হলো। কে কী বলে তার গায়ে বাজে না। সে মুচকি হাসে। আর কাজে মন দেয়। ছইলার কাজ হালকা করাই তার কাজ।

কয়েক মাস কাটলে পরে ছইলা বলল, "ঠাকুরপো, তুমি যে এত কিছু করলে, বলো দেখি আমার কাছ থেকে কী পেলে।"

কান্তি বলল, "সেকালের শিষ্যরা ঋষিদের গোরু বাছুর চরিয়ে যা পেতো তাই। ব্রহ্মবিদ্যা। ঠিক ব্রহ্মবিদ্যা নয়, তার কাছাকাছি। আত্মবিদ্যা।"

জ্যোৎস্নারাত্রে পাশাপাশি বসেছিল তারা, নদীর জলে গা ডুবিয়ে। কে দেখল, না দেখল, ভ্রূক্ষেপ নেই।

"বৌদি," কান্তি বলল ইতস্তত করে, "তোমার সঙ্গে থেকে আমি কী শিখেছি, বলব?"

"বলো।"

"শিখেছি, আমি পুরুষ নই।"

"ওমা, তবে তুমি কী?"

"আমি না-পুরুষ।"

ছইলা হেসে আকুল। বলল, "আর আমি?"

"তুমি? তুমি নারী নও।"

"নারী নই? ঠিক জানো?"

"তুমি না-নারী।"

ছইলা হাসতে হাসতে দম আটকে মারা যাবে মনে হলো। হাসির চোটে জল এলো চোখে। মুখ ফিরিয়ে বলল, "প্রথম ভাগ শেষ করেছ। এখন আর কিছু দিন থেকে যাও।"

এর পরের কয়েক মাস ওরা দুধ দই বেচতে হাটে বাজারে পসরা মাথায় বাঁক কাঁধে ঘুরে বেড়ালো। লজ্জায় কান্তির মাথা কাটা যায়।

লোকের চোখে চোখে টরে-টক্কা। ছইলার কী! সে তো সংসারের বা'র। তা ছাড়া সে মধ্যবয়সিনী। খেলবার বয়স নয়। খেলাবার বয়স।

"আর কিছু পেলে, ঠাকুরপো!" ছইলা শুধায় তারায় ভরা আকাশের তলে।

"পেয়েছি, বৌদি।" কান্তি বলে আত্মস্থ হয়ে। "আমি পুরুষ নই, কিন্তু আমার পুরুষ ভাব।"

"আর আমি?"

"তুমি নারী নও, কিন্তু তোমার নারী ভাব।"

এবার ছইলা হাসল না। তার চোখে জল এলো কি না আঁধারে দেখা গেল না। স্নিগ্ধস্বরে বলল, "আরো কিছু দিন থেকে গেলে হয় না?"

"কেন?" এবার রহস্য করল কান্তি। "তৃতীয় ভাগ পড়তে হবে?"

ছইলা উত্তর দিল না। কান্তি যাবার জন্যে ছটফট করছিল। সে নাচিয়ে মানুষ। কত কাল নাচ ছেড়ে থাকতে পারে! তবু তাকে থাকতেই হলো। কালিদাসকেও থাকতে হয়েছিল বিদ্যানগরের গয়লানীর ঘরে রসের পাঠ নিতে। কান্তির বিদ্যানগর উৎকলে।

ছইলার সঙ্গে গরুর গাড়ীতে করে গেল কুটুমবাড়ী, নৌকায় করে গেল মেলায়। পরের ঘরে হলো ঘরের লোক। গাছতলার আস্তানায় আপন জন। মানুষের বুকে কত যে মধু, তার স্বাদ নিল। দু'দিনের চেনা। মনে হয় জন্মজন্মান্তরের। পাঁজির হিসাবে দুটিমাত্র দিন। হৃদয়ের হিসাবে চিরদিন। কেউ কাউকে ছাড়তে চায় না, বিদায় নিতে গেলে কেঁদে ভাসায়।

মধু, মধু, মধু। মানুষ মধু, পৃথিবী মধু, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।

মাস কয়েক পরে ছইলা বলল, "আর কিছু পেলে কি?"

কান্তি বলল, "পেয়েছি, পেয়েছি।"

"কী পেয়েছ?"

"রস।"

ছইলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে নীরবে শুনে যেতে থাকল, কান্তি বলে যেতে লাগল, "বন্ধনের ভয়ে কখনো কারো সঙ্গে রসের সম্পর্ক পাতাইনি। রসের সম্পর্ক আপনা থেকে পাতা হচ্ছে দেখে দৌড় দিয়েছি। এখন আমার ভয় ভেঙে গেছে।"

"কী করে ভাঙ্‌ল?"

"তোমার সঙ্গে থেকে। তুমি নারী নও। অথচ তোমার সত্তা নারীসত্তা। আমিও পুরুষ নই। অথচ আমার সত্তা পুরুষসত্তা। তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ তোমার সঙ্গে আমার মধুর সম্পর্ক।"

কান্তির প্রয়োজন শেষ হয়েছিল, সে তার সমস্যার সমাধান পেয়েছিল। এবার সে ফিরে যাবে, ফিরে গিয়ে নাচের দল গড়বে, নাচবে, নাচাবে, ভয় পাবে না, ভয়ের কারণ হবে না। মীনাক্ষী যদি তার নৃত্যসহচরী হয় তবে ওর সঙ্গে তার সম্পর্ক হবে বিশুদ্ধ রসের। সে সম্পর্ক হৃদয়কে বাদ দিয়ে নয়, হৃদয়ই তো রসের মধুচক্র। কিন্তু নারীকে বাদ দিয়ে। পুরুষকে বাদ দিয়ে। অথচ নারীসত্তাকে রেখে, পুরুষসত্তাকে রেখে।

ছইলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কান্তি কলকাতা গেল। যা ভেবেছিল তাই। দলের অস্তিত্ব নেই। নতুন করে গড়তে হবে। কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, আবার খুঁজে পেতে ধরে আনতে হবে। মীনাক্ষীর খোঁজ নিয়ে জানতে পেলো সে ঘরসংসার করছে, সুখে আছে। আর নাচবে না। তার স্বামীরও আর উৎসাহ নেই। সে পলিটিক্‌সে নেমেছে।

ইতিমধ্যে দিন বদলে গেছে। নয়া জমানার দর্শকরা কলকারখানার ছোঁয়াচ চায়, কিষান মজদুর কী করে না করে ওরা তা ক্ষেতে খামারে দেখবে না, নাটবেদীতে দেখবে। কান্তিও তো কিছুদিন রাজমিস্ত্রী, করাতী, রং মিস্ত্রী হয়েছে, গোরুর খুরে নাল বসিয়েছে, বাঁক কাঁধে করে হাটে গেছে। এসব অভিজ্ঞতা নৃত্যে রূপান্তরিত করা নিয়ে তার মনে ভাবনা জেগেছিল। কল্পনা তার উপর রং ফলাতে শুরু করেছিল। নতুন ধরণের নাচ দিয়ে সে দেশের লোকের মনোহরণ তো করবেই, দুঃখীদের দুঃখমোচনও করবে। তামাশা নয়। গান দিয়ে সেকালের গুণীরা আকাশ থেকে বর্ষা নামাতেন। অনাবৃষ্টির দিন গাইয়েরাই ছিলেন মানুষের শেষ আশা। একালের নাচিয়েরাই বোধ হয় মানুষের শেষ ভরসা।

কান্তির দল বরফের গোলার মতো দিন দিন বেড়ে চলল। করাত নৃত্য, বাঁক নৃত্য ইত্যাদি আনকোরা নাচ দর্শকদেরও টেনে আনল। একজন ক্যাপিটালিস্ট মুগ্ধ হয়ে ধনসম্পদ উৎসর্গ করলেন। তবে ম্যানেজিং ডিরেক্টর তিনিই হলেন। অনুতাপে বিনম্র হয়ে ধনিক পরিবারের কন্যারাও মজুরনী কিষানী সাজতে এগিয়ে এলেন। নয়া জমানা। সেকালের যাত্রায় হাড়িডোমের উচ্চাভিলাষ ছিল রাজা মন্ত্রী সাজতে। একালের ফিল্মে উঁচু ঘরানাদের সাধ অচ্ছুৎ-কন্যা সাজতে।

ভারতের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ প্রদক্ষিণ করে কান্তির দল অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ইউরোপের দিকে পা বাড়াল। তাদের জাহাজ যেদিন বম্বে ছাড়বে সেদিন হঠাৎ চার বন্ধুর পুনর্মিলন। অনুত্তম, কান্তি, তন্ময়, সুজন। রূপকথার চার কুমার।

সাফল্যের নেশায় কান্তির মাথা ঘুরে গেছল। তা হলেও কোনো দিন সে ভুলে যায়নি যে সে কান্তিমতী রাজকন্যার অন্বেষণে বেরিয়েছে, যে রাজকন্যা তার হাতের কাছে, অথচ নাগালের বাইরে। অন্তরে অন্তরে তার ব্যথা জমছিল। বাইরে যদিও অন্তহীন ফুর্তি।

কেন ব্যথা? কারণ তার নৃত্যসহচরী হবার জন্যে আজকাল দস্তুরমতো প্রতিযোগিতা। তাই সবাইকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে সে সকলের সঙ্গে নাচে। গোপী সকলেই। রাধা কেউ নয়। রসের সম্পর্ক পাতিয়ে এক সমস্যার সমাধান হলো, কিন্তু আরেক সমস্যা নতুন করে দেখা দিল। সে তো কৃষ্ণের মতো অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী নয় যে একই সময়ে দশটি গোপীর সঙ্গে রাসনৃত্য করতে পারবে। দশটির মধ্যে একটির সঙ্গেই সে তা পারে। কিন্তু তা হলে একজনকে প্রাধান্য দিতে হয়। মীনাক্ষীর স্থান দিতে হয়।

সাফল্যের দিনে অত বড় একটা ঝুঁকি নিতে তার সাহসে কুলায় না। আছে একটি মেয়ে তার নজরে। খুবই অল্পবয়সী। কুমারী। কিন্তু রত্নাকে সে যদি রাধার সম্মান দেয় গোপীরা তাকে ক্ষমা করবে না। দলে ভাঙন ধরবে। তা না হয় হলো। কিন্তু রত্না নিজেই স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করবে সম্পর্কটাকে অক্ষয় করবার জন্যে। নাট-বেদীতে তো বটেই, বিবাহবেদীতেও। শেষকালে ঐ রত্নাকেই কেন্দ্র করে ঘুরবে তার জীবন, তার জীবিকা, তার শিল্প, তার দল। ঐ রত্নাই হবে তার দলের একমাত্র সম্বল। মুথুলক্ষ্মী, খুরশিদ, ফিরোজা, ইন্দিরা, হান্‌সা—এরা কি থাকবে!

বিয়ে যখন করবেই না তখন রত্নাকে রাধার ভূমিকা না দেওয়াই ভালো। পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এড়াতেই হবে। নীড় রচনার স্বপ্ন মুকুলেই ঝরে যাক। রত্না শিখুক আকাশে উড়তে, আকাশেই বিশ্রাম করতে। তা যদি না পারে তবে অন্য কাউকে বিয়ে করুক। কান্তিকে নয়।

কিন্তু এ কথা ভাবতেও যে তার কষ্ট হচ্ছিল না তা নয়। রত্না এক দিন বড় হবে, তার বাপ মা তার বিয়ে দেবেন, তার মতো সুন্দর মেয়ের জন্যে পাত্রের অভাব হবে না। দূর হোক অপ্রীতিকর ভাবনা। আপাতত ইউরোপ আমেরিকা ঘুরে আসা যাক। দিগ্বিজয়ীর মতো।

বম্বের কয়েকটা ঘণ্টা বন্ধুদের সঙ্গে খেয়ে গল্প করে ফোটো তুলিয়ে কেটে গেল। ভাব বিনিময়ের জন্যে সময় ছিল না। উপাখ্যান বলার জন্যে তো নয়ই। জাহাজ ধরতে হবে। একশো রকমের খুঁটিনাটি। মনটা ভারী হয়ে রয়েছে সুমতির জন্যে। সেও চেয়েছিল সহযাত্রিণী হতে। তার তুলার ব্যাপারী স্বামী বাদ সাধলেন। তবে মনটা খুশ আছে আরেকটা খোশ খবরে। প্যারিসের বিখ্যাত নর্তকী ইভেৎ তার দলে যোগ দিতে উৎসুক।

জাহাজ ছাড়বে, জাহাজ থেকে নেমে যাবার সময় সুজন বলল, "প্যারিসে হয়তো সোনিয়ার সঙ্গে দেখা হবে। তাকে লিখব তোর কথা।"

কান্তি বলল, "বেশ, বেশ। যদিও জানিনে কে তিনি। আহা! শোনা হলো না তোর কাহিনী! তন্ময়েরটা মোটামুটি শুনেছি। আর অনুত্তম, তোরটাও শোনা হলো না। সুজন তবু হেড লাইনটা শুনিয়ে রেখেছে। সোনিয়ার নাম করে। তুই কিন্তু একটুখানি আভাস পর্যন্ত দিসনি।"

ঐখান দিয়ে চলাফেরা করছিল রত্না। কান্তি তার গলা জড়িয়ে ধরল এক হাতে। অমনি মনে হলো দলের লোক ঠাওরাবে সে অপক্ষপাত নয়। তখন আরেক হাত বাড়িয়ে দিল ফিরোজার কাঁধে। নিজের অপক্ষপাতিতায় নিজেই তৃপ্ত হয়ে সে তার বন্ধুদের বলল, "পুনর্দর্শনায় চ।"

১৯৪৯ সালের বড়দিন। তন্ময় এসেছে সপরিবারে কলকাতায়। উঠেছে পৈত্রিক বাসভবনে। বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে। কান্তি এসেছে সদলবলে। অতিথি হয়েছে এক মহারাজার প্রাসাদে। মধ্য-প্রদেশের মহারাজা। অনুত্তম এসেছে নোয়াখালী থেকে, সহকর্মী সংগ্রহ করতে। সুজন তাকে ধরে নিয়ে গেছে অশ্বিনী দত্ত রোডে, নিজের বাড়ীতে। বাড়ীখানা ছোট দোতালা। কিন্তু তার চার দিকে দুর্ভেদ্য প্রাচীর। দাঙ্গা বাধলে আর যেখানেই বাধুক এ পাড়ায় না। নেহাৎ যদি বাধেই দেয়ালের হেঁয়ালি সমাধান করতে পারবে না।

"আগে নিরাপত্তা। তার পরে অন্য কথা। যে টাকায় তেতালা হতো সে টাকায় মাজিনো ওয়াল হয়েছে বলে সীতার সঙ্গে আমার ঝগড়া। বলে, এটা অবন ঠাকুরের অশোকবনের আইডিয়া।" সুজন বলছিল অনুত্তমকে।

"নোয়াখালীতে," বলছিল অনুত্তম, "যে গাঁয়ে সব চেয়ে বিপদ সেই গাঁয়েই আমার কুঁড়ে ঘর। গুণ্ডারা আমাকে ঘিরে রয়েছে, তাই আমি সবচেয়ে নিরাপদ।"

সুজনের গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। "য়্যাঁ! বলিস কী! তা হলে তো, ভাই, তোকে ফিরে যেতে দেওয়া চলে না। বিয়ে হয়নি বলে কি তোর প্রাণের মূল্য নেই? তোর স্ত্রী থাকলে কি তোকে আদৌ যেতে দিতেন?"

"স্ত্রী থাকলে কী করতেন জানিনে, কিন্তু যার অন্বেষণে বাহির হয়েছি তিনি যে আমাকে বিপদের দিকেই টানছেন। যেন সেইখানেই মিলনের সঙ্কেত স্থল।"

সেদিন ওরা দুই বন্ধু অপর দুই বন্ধুর প্রতীক্ষা করছিল।

আগে পৌঁছল তন্ময়। তিনজনে কোলাকুলি করে নীরব রইল কিছুক্ষণ। তার পরে সুজন বলল, "সীতা বাড়ী নেই। আফসোস জানিয়েছে। ওর বোনের সন্তান হবে বলে রাত জাগতে হবে।"

"আমার কিন্তু রাত করে ফিরতে মানা। রেবা একটুও রাত জাগতে পারে না।" মুরগীতে ঠোকরানো স্ত্রৈণ স্বামীর মতো সভয়ে বলল তন্ময়। তার মাথার চুল চৌদ্দ আনা শাদা। কিন্তু শরীর আগের চেয়ে চিকণ। একটি বড় মাপের খোকা পুতুলের মতো চেহারা। গৃহিণীর হাতযশ সর্বাঙ্গে। স্বচ্ছন্দে আশী বছর বাঁচবে।

ওদিকে সুজনের মাথাজোড়া টাক। সেটা অবশ্য নতুন কিছু নয়, কিন্তু ঘরণীর হেফাজতে তন্ময়ের যেমন চেকনাই হয়েছে সুজনের তেমন হয়নি। ওকে যেন তুলোয় মুড়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। সাবধানে থাকলে সুজনও আশী বছর বেঁচে থাকতে পারে। দাঙ্গাবাজদের রুখতে যেমন দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলেছে অদৃশ্য ব্যাধিবীজদের রুখতে তেমনি তুমুল আয়োজন করেছে। তিন চার আলমারি ওষুধে বোঝাই।

অনুত্তম চুল ছেঁটেছে কদম ফুলের মতো। ছোট ছোট খোঁচা খোঁচা চুল। দাড়ি কিন্তু রক্তবীজের ঝাড়। চাঁছলে বাগ মানে না বলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বোধ হয় নোয়াখালীর মোল্লাই ফ্যাশন। চোখে সেই বিখ্যাত নীল চশমা। শরীরটা মাংসবহুল নয়, পেশীবহুল। শিরাগুলো ঠেলে বেরোচ্ছে। শক্ত গাঁথুনি। যৌগিক ব্যায়াম করে। গায়ে কোর্তার বদলে চাদর জড়ানো, ধুতীও সংক্ষেপিত। হাঁ, খদ্দরের। দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা প্রতি অঙ্গে। পরিচ্ছদে।

মহারাজার মোটরে করে এলো কান্তি। ও গাড়ী কখনো এত ছোট বাড়ীর সামনে দাঁড়ায়নি। কিন্তু এটা রাজপুরী না হোক দুর্গ তো বটে। ছোটখাট ফোর্ট উইলিয়াম। লাফ দিয়ে ফুর্তি করে

ছাপে উঠল কান্তি। বলল, "শীত কোথায় কলকাতায়! এইখানে বসা যাক কফির পেয়ালা নিয়ে। আর, সুজন, তুই আয়। অনুত্তম, তন্ময়, তোরাও বন্ধ ঘরে বসে থাকিস নে, বুড়ো হয়ে যাবি।"

চির তরুণ। নানা রঙের রেশমী পোশাক। বাবরি চুল। ফুলের মালা। যেমনটি ছিল পঁচিশ বছর আগে তেমনিটি আছে পোয়া শতাব্দী পরে। তবে মুখভাবে এক প্রকার কঠোরতা এসেছে। চরিত্রের কঠোরতা। তার তপোভঙ্গ করা মেনকার অসাধ্য।

"পড়েছি এক মহারাজার পাল্লায়।" রগড় করে রসিয়ে রসিয়ে বলল কান্তি। "খরচ বেঁচেছে। কিন্তু জান বাঁচে কি না সন্দেহ।"

"তার মানে?" কৌতূহলী হলো তন্ময়।

"দু'বেলা শুনতে হচ্ছে নতুন এক স্লোগান। এক স্বামী এক স্ত্রী। দেশটা দিন দিন হলো কী! রাজাগুলোও ধুয়ো ধরেছে এক স্বামী এক স্ত্রী। সরদার বল্লভভাই এমন হাল করেছেন যে একটির বেশি পুষতে পারে না। পণ্ডিত জবাহরলালই বা কম কিসে! ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট একটি রানীকেই দেবেন, আর সব রানীদের সাধারণ পাসপোর্ট। বিপ্লব হবে না? প্যালেস রেভলিউশন শুরু হয়ে গেছে। মহারাজা এর মধ্যেই তাঁর রক্ষিতাদের বিদায় করে দিয়েছেন। রানীদের একটিকে রেখে বাকী তিনটিকে স্বাধীন জীবিকায় সুপ্রতিষ্ঠ করতে চান। একটিকে হয়তো আমার দলে যোগ দিতে বলবেন। সেই রকম তো শুনছি।"

"দেখিস্, ভাই। পদচালনা করতে গিয়ে পদস্খলন না হয়!" অনুত্তম বলল গম্ভীর স্বরে। "মহারানী শুনে মহাভয় লাগছে।"

"হা হা!" কান্তি অনুত্তমের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, "তেমনি কাঠখোট্টা আছিস্। রসকষ এক ফোঁটা নেই। ওরে, আমার কাছে ময়রানীও যা মহারানীও তাই। মাজুরকা নেচে এলুম পোলাণ্ডের চাষানীদের সঙ্গে, পোল্‌কা নেচে এলুম চেকোস্লোভাকিয়ার

মজুরনীদের সঙ্গে। আমেরিকার ক্রোড়পতিদের দুহিতাদের সঙ্গে নেচে এলুম ফক্‌স্‌ট্রট আর ট্যাঙ্গো। ইংলণ্ডের কাউণ্টেস ও ব্যারনেসদের সঙ্গে নেচে এলুম সার রজার ডি কভারলী। কোনোখানেই পা ফসকায়নি। শেষে কিনা চৌকাঠের উপর আছাড় খেয়ে পড়ব!"

"তবু", মন্তব্য করল সুজন, "সাবধানের মার নেই।"

"তা হলে," কান্তি সুর নামিয়ে বলল, "খুলে বলি। কারো সঙ্গে আমি রসের সম্পর্ক ভিন্ন আর কোনো সম্পর্ক পাতাইনে। কিন্তু রস বলতে আমি রতিরঙ্গ বুঝিনে। বুঝি লীলাকমলের নির্যাস। এর ফলে বার বার ফল্‌স্‌ পোজিশনে পড়তে হয়েছে। তেমন অবস্থায় পড়লে আমার নিয়ম হচ্ছে, দে দৌড়। দৌড়তে দৌড়তে আমি এত দূর এসেছি। আমার জীবনটাই একটা ম্যারাথন রেস।"

হো হো করে হেসে উঠল তন্ময়। টিপে টিপে হাসল সুজন। অনুত্তম গম্ভীর ভাবে বলল, "ম্যারাথন রেসে পতনও ঘটে।"

কান্তি বলল সকৌতুকে, "তা বলে চেহারাটাকে সজারুর মতো করে অর্ধেক সমাজের কাছে ঘোষণা করব না, ছুঁয়ো না আমাকে।"

হাসতে হাসতে তন্ময় গড়িয়ে পড়ল সুজনের গায়ে, সুজন মুখ ফেরালো।

তারপর কান্তি তাদের সবাইকে মাতিয়ে রাখল নিজের জীবনের কাহিনী বলে। ঘড়িগুলোকে সরিয়ে দেওয়া হলো কেউ যাতে টের না পায় রাত কত হয়েছে। ওদিকে রেবা হয়তো ছটফট করছে। তা একটু করলই বা। এদিকে সুজনও তো ছটফট করছে সীতার জন্যে।

কান্তির কাহিনীর অনেকখানি আমাদের জানা। সে অংশের পুনরাবৃত্তি করব না। যেটুকু অজানা সেটুকু এই।

কান্তিরা যখন ইউরোপে যায় তখন মহাযুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে। তার কালো ছায়া সকলের জীবনে। তা বলে নাচবে না, নাচ দেখবে না, তেমন বেরসিক ইউরোপের লোক নয়। কান্তিরা পরম সমাদর লাভ করে। কিন্তু হিটলারের চালচলন দেখে হিতৈষীরা পরামর্শ দেন, আসল শিবতাণ্ডব শুরু হলে নকল শিবতাণ্ডব দেখবে কে! মাঝখান থেকে আটকা পড়বে তোমরা। সময় থাকতে আমেরিকায় সরে পড়ো। আটলাণ্টিক পেরিয়ে দেখে সেখানেও থমথমে ভাব। তবে অঢেল টাকা। কান্তিরা ঝম ঝম করে নাচে আর ঝন ঝন করে টাকা ঝরে। টাকার গাছে নাড়া দিয়ে ফল কুড়োতে ব্যস্ত। খেয়াল নেই যে জাপানীরা পার্ল হারবারে হানা দিয়েছে। যখন টনক নড়ে তখন দেখে দেরি হয়ে গেছে! দেশে ফেরবার জলপথ আকাশপথ বন্ধ। স্থলপথের তো কথাই ওঠে না।

সঞ্চয় ভেঙে ক'দিন চালাতে পারে! যে যেখানে পারে চাকরি নেয়। যে কোনো চাকরি। রত্না গেল মেয়েদের অক্‌জিলারি কোর-এ। কান্তি গেল য়াম্বুল্যান্সে। মুথুলক্ষ্মী ফিরোজা বাবনজী মিশিরজী এঁরা ছড়িয়ে পড়লেন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে। বিচিত্র কার্যে। যুদ্ধশেষে একে একে ফিরে এলো অনেকে। যারা ফিরল না তাদের মধ্যে রত্না। সে বিয়ে করে সেখানকার এক সিন্ধীকে। আবার দল গড়তে হলো। গড়তে হলো নতুন লোক নিয়ে। পুরোনোরা ধনের স্বাদ পেয়েছে, মোটা তন্‌খা না পেলে আসবে না। এসে করবেই বা কী! নাচতে তো ভুলে গেছে। নতুন যারা এলো তাদের তালিম দিতে দিতে বছরের পর বছর গেল গড়িয়ে। এই সম্প্রতি কান্তি সদলবলে আসরে নেমেছে। কিন্তু অনভ্যাসের দরুণ অনায়াস নয় পদক্ষেপ। মনের মতো সাথী নেই বলে লীলায়িত নয় ভঙ্গী। রত্না তার চেয়ে বয়সে যথেষ্ট ছোট ছিল। এরা তো তার মেয়ের বয়সী। এদের সঙ্গে নাচা যেন খোকাখুকুর নাচন।

পশ্চিম থেকে কৌশল শিখে এসেছে প্রচুর। জীবনের অভিজ্ঞতাও প্রভূত। কিন্তু রূপ দিতে গিয়ে দেখছে এক হাতে হয় না। মহারানী কি সত্যি যোগ দেবেন?

এর পর তন্ময়ের কাহিনী। তার প্রায় সবটাই আমরা জানি। বাকীটুকু এক নিঃশ্বাসে বলা যায়। তন্ময়কে রাজ একবার টেলিফোন করে তার ক্লাবে। কী একটা খবর ছিল, সাক্ষাতে জানাবে। তন্ময় তার সঙ্গে দেখা করেনি, তাকে দেখা করতেও দেয়নি। কিছুদিন বাদে শুনতে পায় রাজ আবার বিয়ে করেছে। বিয়ে করে চলে গেছে তিব্বতে। যার সঙ্গে গেছে সে একজন ফরাসী বৌদ্ধ লামা। রক্তাম্বর সম্প্রদায়ের লামাদের বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। তিব্বতে বহু-কাল কাটিয়ে ওরা এখন হিমালয়ের কোন এক উপত্যকায় অজ্ঞাতবাস করছে। এদিকে ঘোরতর বিষয়ী হয়ে উঠেছে তন্ময়। মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে। ছেলেকে বিলেত পাঠাচ্ছে। স্ত্রীর জন্যে বাড়ী কিনছে লণ্ডনের উপকণ্ঠে।

তন্ময়ের পরে অনুত্তম। তার কাহিনীর অধিকাংশ আমরা জানি। অবশিষ্ট লিখছি। অনুত্তম ও তারা একই দিনে ছাড়া পায়। কংগ্রেস আবার প্রাদেশিক সরকারের ভার নিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা নিয়ে ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে দরদস্তুর চলছে। তারা বলে, সংগ্রাম করতে আর ভালো লাগছে না। দরকারও দেখছিনে। এসো, চুপচাপ একসঙ্গে থাকি। মানুষের কি ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু নেই? দেশের ভার আর যেই নিক, অনু, ঘরের ভার তুমি আমি নিই। অনুত্তম বুঝতে পারে তারার মনে কী আছে। বিয়ে। ঘরসংসার। ছেলেমেয়ে। বয়সও তো হলো কম নয়। লবণ সত্যাগ্রহের সময় থেকে দেশের কাজে নেমেছে। বড় ঘরের মেয়ে। বাপ মা'র কথা শোনেনি। বিয়ে করেনি। অনুত্তমেরও কি সাধ যায় না সুখী হতে, শান্তি পেতে! তারার মতো সঙ্গিনী পাবে

কোথায়! তার পরম সৌভাগ্য, তারা তাকে মনোনয়ন করেছে। সে স্বয়ংবর সভার বীর।

কিন্তু অনুত্তমের যে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। দেশ স্বাধীনতা না পেলে সেও স্বাধীনতা পাবে না। বিয়ে করবে না ততদিন। তার পরে যাকে করবে সে নিবন্ত সলতে নয়, জ্বলন্ত শিখা। বেচারি তারা যে এখন থেকেই নিবু নিবু। সে তেজ নেই। সে দাহ নেই। এ কি সেই তারা! সেই পদ্মাবতী! মনে তো হয় না। অনুত্তম বলে, আমি ধন্য। কিন্তু নিরুপায়। তারা, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

তারাকে কানপুরে পেঁৗছে দিয়ে অনুত্তম দিল্লীতে কয়েক মাস কাটায়। কলকাতার দাঙ্গা তাকে বিচলিত করে, কিন্তু বল্লভভাই তাকে অন্য কাজে লাগান। নোয়াখালীর ডাক শুনে সে আর স্থির থাকতে পারে না। গান্ধীজীর সঙ্গে যোগ দেয়। তখন থেকে নোয়াখালীতেই তার স্থান। গান্ধীজী নেই, তবু কাসাবিয়াঙ্কার মতো সে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে আগুনলাগা জাহাজের ডেক-এ। কোথায় তার পদ্মাবতী! কবে ফুটে উঠবে পদ্ম ফুলের মতো কন্যা আগুনের পালঙ্কে!

অনুত্তমের পর সুজন। সুজনের কাহিনীর অল্পই আমাদের অজানা। সেটুকু বলি। বিদেশ থেকে ফিরে সুজন দেখে তার বাবা কোনো মতে নিঃশ্বাস ধারণ করে রয়েছেন বৌমার কোলে মাথা রেখে নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন এই আশায়। তাঁর যন্ত্রণার অবসান হবে সে যদি তাঁর কথামতো বিয়ে করে। নইলে তাঁর যন্ত্রণা দীর্ঘতর হবে। ছেলের মুখে "না" শুনলে হয়তো তিনি তৎক্ষণাৎ হার্ট ফেল করে মারা যাবেন। এমন বিপদেও কেউ পড়ে! সুজন চোখ বুজে বিয়ে করল। আর বাবা বৌমার কোলে মাথা রেখে চোখ বুজলেন। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য।

বিয়ে মোটের উপর সুখের হয়েছে। সীতা সেকালের সীতার মতো পতিব্রতা। নিজের জন্যে কিছু চায় না। ঝি চাকর রাখতে দেয়নি। নিজেই রাঁধে। সেইজন্যেই সুজনের হাতে টাকা জমতে পেরেছে। অধ্যাপনা করে, সিনারিও লেখে, অভিনয়ের মহড়ায় উপস্থিত থেকে নির্দেশ দেয়। এই সব করে সুজন একরকম গুছিয়ে নিয়েছে। একটি সন্তান হয়েছিল। বাঁচল না।

মধ্যে একদিন ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে বকুলের সঙ্গে অকস্মাৎ দেখা। সুজন প্রথমটা চিনতে পারেনি। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, কাঠ কয়লার মতো কালো হয়ে গেছে বকুল। কী একটা সাংঘাতিক অসুখ করেছিল তার। ছ'বছর ভুগতে হয়েছে। বহু দেশ বেড়িয়ে এখন একটু ভালো বোধ করছে। বকুল যদিও বলল না তবু সুজন বুঝতে পারল কী সে অসুখ। · কে তার জন্যে দায়ী। বকুলের চাউনি এড়াবার জন্যে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল। সে চাউনি বঞ্চিতা নারীর। বকুল বিশ্বাস করেনি যে সুজন সত্যি সত্যি বিয়ে করবে আরেকজনকে। মুখে অনুমতি দিয়েছিল বটে। মন থেকে তো দেয়নি। জ্বলেপুড়ে মরছে।

চার জনের কাহিনী সাঙ্গ হলে চার দিক নিস্তব্ধ হলো। রাত তখন অনেক। ঘড়ি আনিয়ে দেখা গেল বারোটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকী। তন্ময় লাফ দিয়ে উঠল। সুজন তাকে ধরে বসিয়ে দিয়ে বলল, "এটা বছরের শেষ রাত্রি। একটু পরে আরম্ভ হবে নব বর্ষ।"

"সিলভেস্টার!" কান্তি চমকে উঠে বলল, "নাচতে ইচ্ছা করছে যে।"

তন্ময়েরও ইচ্ছা করছিল নাচতে। দুই বন্ধুতে হাত ধরাধরি করে নাচতে শুরু করে দিল। ওদের বেহায়াপনা দেখে অনুত্তম বিষম অপ্রসন্ন হলো। সুজন গেল সাপার আনতে। খেতে খেতে

বারোটা বাজিয়ে দেওয়াই রেওয়াজ।

"যত সব বিদ্ঘুটে কাণ্ড!" অনুত্তম ফেটে পড়ল যখন লক্ষ্য করল সুজন দুই হাতে দুই গ্লাস তরল পদার্থ নিয়ে উঠে আসছে।

ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। ততক্ষণে ওরা স্যাণ্ডউইচ পনীর ও বিস্কুট খেতে বসেছে। অনুত্তমের জন্যে গরম দুধ। আর সকলের জন্যে দ্রাক্ষারস। চার জনেই চার জনকে বলল, "নববর্ষ সুখের হোক।"

কান্তি বলল, "আজ থেকে আবার আমাদের যাত্রারম্ভ। যে জীবন পিছনে পড়ে রইল তার দিকে ফিরে তাকাব না। যে জীবন সামনে তার দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাব!"

"তোর সঙ্গে যতক্ষণ আছি," তন্ময় বলল, "ততক্ষণ মনে হচ্ছে আমার বয়স বিশ একুশ বছর। তা তো নয়। একটু পরে যেই বাড়ী ফিরব অমনি মালুম হবে ষাট বাষট্টি বছর। জীবনের আর ক'টা বছর বাকী আছে যে নতুন করে যাত্রারম্ভ করব! কার অভিমুখে পদক্ষেপ? তাকে যে, ভাই, চিরকালের মতো হারিয়েছি। আমার রূপমতীকে।"

"আমিও আমার কলাবতীকে।" বলল সুজন। "কেন বেঁচে থাকব, কিসের প্রত্যাশায় বেঁচে থাকব, সেইটেই বুঝতে পারছিনে। লিখতে বসলে লেখা আসে না। সাহিত্যের পাট চুকে গেছে। পয়সার জন্যে এ যা করছি এ তো ব্যবসাদারি। বয়সটা আমার আজ পঁচিশ বছর কমে গেছে, কিন্তু কাল বকুলের দিকে তাকালে হু হু করে বেড়ে বাহাত্তর হবে। যাত্রারম্ভ আমার জন্যে নয়।"

"এই ক'বছরে আমার বুকে শেল বিঁধেছে।" বলল অনুত্তম। "শেল বিঁধে রয়েছে। দেশ ভগ্ন। লক্ষ লক্ষ মহাপ্রাণী নিহত, উন্মূলিত, ধর্ষিত, নষ্ট। মহাগুরু নিপাতের পাপে জাতীয় শরীর বিষাক্ত। বেঁচে আছি বলে আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি। তবু বাঁচতে

হবে। এখনো তার সঙ্গে শুভদৃষ্টি বাকী। আমার পদ্মাবতীর সঙ্গে। তা বলে যাত্রারম্ভ! না, ভাই। সে উৎসাহ নেই। বয়স আমার কমেনি। আজকের দিনেও।”

কান্তি ভেবে বলল, “আমাদের ’পর ভার পড়েছে আমরা আদি কাল থেকে চলে আসতে থাকা একটি অন্বেষণের ধারাকে বহমান রাখব। অন্বেষণ সার্থক হলে তো ফুরিয়েই গেল। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় নয় যে ফুরিয়ে যায়। তাঁর সৃষ্টি যেমন অসমাপ্য আমাদের অন্বেষণও তেমনি। অন্বেষণ চলতে থাকবে। আরো লক্ষ লক্ষ বৎসর। নিরবধি কাল।”

“আমি কিন্তু এ ভার বইতে পারছিনে, ভাই।” দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল তন্ময়। “আমি সরে দাঁড়ালুম। অন্বেষণ চলতে থাক। আমি অচল। রাজ যেদিন চলে যায় সেই দিন থেকে অচল। সেদিন আমার উচিত ছিল তার অন্বেষণ করা, তার পশ্চাদ্ধাবন করা। সব সহ্য করে তার সঙ্গে লেগে থাকা। তা তো আমি পারলুম না। আমি এক হিসাবে অসমর্থ পুরুষ। নেহাৎ মিথ্যে বলেনি সে। দৈহিক অর্থই একমাত্র অর্থ নয়।”

“আমারও ভুল হয়েছিল বকুলের মুখের কথাকে মনের কথা ভেবে তার অন্বেষণ ছেড়ে দেওয়া, তার পশ্চাদ্ধাবন ত্যাগ করা।” সুজন বলল অনুশোচনার সঙ্গে। “বিবাহের বাসনা প্রবল হয়েছিল, বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুযন্ত্রণা সইতে পারিনি। তখন তো বুঝতে পারিনি যে বকুলের জীবনের মূলে কুড়ুলের কোপ লেগেছে। বকুল এখন ছিন্নমূল। আমিও তাই। অন্বেষণের ধারা বহমান রাখা কি আমার কাজ! অনুত্তম, কান্তি, তোরা দু’জনে এগিয়ে যা। তোদের দু’জনের মধ্যেই সার্থক হব আমরা দু’জন। তন্ময় আর আমি।”

“আমার দৌড় কতটুকু!” অনুত্তম বলল ভাঙা গলায়। “মহাত্মা বলে রেখেছিলেন তিনি ভ্রাতৃহত্যার জীবন্ত সাক্ষী হবেন

না। আমিও বলে রেখেছি যে আর একটা সাম্প্রদায়িক নরমেধ ঘটলে আমি প্রাণ দেব। অন্বেষণের ধারা বহমান রাখা আমার পক্ষে কী করে সম্ভব! আমাকেও বাদ দে। ঐ কান্তিই আমাদের সকলের যৌবন। ওর সার্থকতাই আমাদের সার্থকতা।"

তখন ওরা কান্তিকে ঘিরে বসল। বলল, "কান্তি, তুই আমাদের সকলের তারুণ্য। তোর সার্থকতায় আমাদের সার্থকতা। অন্বেষণের ধারা অব্যাহত থাকবে তোর মধ্যে, তোর অন্বেষণের মধ্যে। জীবন-মোহনের যোগ্য উত্তরসাধক তুই, কান্তি। আমরা নই।"

কান্তি অভিভূত হলো। ধীরে ধীরে বলল, "আমার ঘর নেই। আমি অনিকেত। আমার সংসার নেই। আমি অসংসারী। আমার সঞ্চয় নেই। আমি অসঞ্চয়ী। সম্বল বলতে আমার একটা সুটকেস ও একখানা কম্বল। কোথাও বাঁধা পড়ব না বলে বিয়ে করিনি ও করব না। বিবাহই একমাত্র বন্ধন নয়। তার চেয়ে বড় বন্ধন সুরত। সে বন্ধনও আমি পরিহার করেছি ও করব। কিন্তু নারীকে আমি পরিহার করিনি। করব না। তার রস আস্বাদন করেই আমি ক্ষান্ত। নারীর মধ্যে চিরন্তন হচ্ছে তার রস। তার রসকলি।"

"তাই কি!" অনুযোগ করল অনুত্তম। "চিরন্তন হচ্ছে তার শক্তি। তার সিঁথির সিঁদুর।"

"চিরন্তন তার অন্তর্দীপ্তি। তার তুলসী তলার প্রদীপ।" নিবেদন করল সুজন।

"তার অঙ্গসুষমা। তার নীবিবন্ধ।" অভিমত দিল তন্ময়।

কান্তি হেসে বলল, "এ সেই অন্ধের হাতী দেখার মতো হলো। আমরা চার জনে চার জায়গায় হাত রেখেছি। চার জনের সত্য যদি এক জনের হয়, চার জন যদি হয় এক জন, তা হলে আমাদের সকলের কথা হবে এক কথা। পাই আর না পাই, হারাই আর না হারাই, আমরা কেউ ব্যর্থ হইনি। আমাদের চারটি কাহিনী মিলে একটি

কাহিনী।"

"সে কাহিনী একই রাজকন্যার, যে কন্যা সব নারীর রূপরূপ।" বলল সুজন।

"যে নারী চিরন্তনী।" বলল অনুত্তম।

"যে চিরন্তনী ক্ষণিকা।" বলল তন্ময়।

কান্তি তার বন্ধুদের হাত নিজের হাতের ভিতর টেনে নিল। বলল, "পিছন ফিরে তাকাব না। কিন্তু যদি তাকাই তা হলে যেন এককেই দেখতে পাই, একাধিককে নয়। যখনি তাকাই তখনি যেন দেখতে পাই সেই এককের অফুরান সৌন্দর্য।"

"অফুরন্ত প্রীতি।" ইতি সুজন।

"অসীম সাহস।" অথ অনুত্তম।

"অপার করুণা।" অতঃপর তন্ময়।

রাত গভীর হয়ে আসছিল।. আর দেরি করা যায় না। সুজনের উনি যে কোনো সময় এসে পড়বেন। তন্ময়ের ইনি ক্ষমা করবেন না। অনুত্তমের চিটাগং মেল সকাল ছ'টায়। কান্তিকে মহারাজা প্রাতরাশের নিমন্ত্রণ করেছেন। মহারানীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন।

কান্তি বলল, "সামনের দিকে তাকালেও সেই এককেই দেখতে পাব। তন্ময়ের ঘরে তিনিই এসেছেন। সুজনের ঘরেও তিনি। কোনো খেদ রাখব না। ধন্যতা জানাব পদে পদে, কথায় কথায়।"

"শত শত ধন্যবাদ।" জানাল অনুত্তম।

"শত সহস্র ধন্যবাদ।" জ্ঞাপন করল তন্ময়।

"সহস্র সহস্র ধন্যবাদ।" শেষ করে দিল সুজন।

একা কান্তি যাত্রা করল চার জনের হয়ে। অন্বেষণের ধারা বহমান রাখতে। যৌবনের প্রান্তে উপনীত হয়ে তন্ময় সৃজন অনুত্তম আবিষ্কার করল যৌবন ফুরিয়ে যায়নি। যৌবনের স্বপ্ন মিলিয়ে যায়নি। যেখানে অস্ত সেখানেই উদয়। যেখানে অন্ত সেইখানে আদি। যেমন বর্ষশেষ ও বর্ষারম্ভ।

(১৯৫২-৫৩)